সাংবাদিকে
চোখে
ইসলামী বিপ্ল
ইমামের ইরান
বিপ্লবের দেশ

সাংবাদিকের চোখে ইসলামী বিপ্লব

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ
ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র
ঢাকা,
বাংলাদেশ

প্রথম প্রকাশ ঃ
ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ
মে, ১৯৮৪

প্রচ্ছদ ঃ
মামুন কায়সার

মুদ্রণ ঃ
পাইলোয়ান প্রেস
৫৫ উত্তর শাহজাহানপুর,
ঢাকা-১৭

SANGBADIKER CHOKHEY ISLAMI BIPLOB.
(Islamic Revolution in The Eyes of The Journalists).
: A Compilation of articles on Islamic Revolution in Iran published in different Bengali newspapers written by the Journalists who visited Iran.

Published by the Cultural Centre of the Islamic Republic of Iran, Dhaka, Bangladesh.

First Edition : 6th February, 1984.
Second Edition : 15th May, 1984.

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইরানের ইসলামী বিপ্লব ইরানে পরাশক্তিবর্গের শোষণ-লুণ্ঠনের স্বার্থকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। উপরন্তু বিপ্লবের পর ইমাম খোমেনীর "We will export our revolution" ঘোষণাটি পরাশক্তি এবং তাবৎ বিশ্বের গণ-বিরোধী সরকারগুলোর মধ্যেও বেশী ত্রাসের সৃষ্টি করেছে। ফলে সাম্রাজ্যবাদের করতলভুক্ত আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি প্রচার মাধ্যম-গুলো ইসলামী বিপ্লব ও ইরান সম্পর্কে একটা কুৎসিৎ চিত্র তুলে ধরার কাজেই ব্যস্ত রয়েছে।

ইরানের ইসলামী সরকার মুসলিম উম্মাহ্ ও বিশ্বের মজলুম মানবতার কাছে ইসলামী বিপ্লবের সঠিক চিত্র উপস্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের আহ্বান পেঁাছে দেয়ার কাজকে ফরজ মনে করেন। সে কারণেই তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল বিশেষত মুসলিম দেশগুলোর সাংবাদিক-দের প্রায়শঃই বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে বিভিন্ন সময়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বাংলাদেশেরও কয়েকজন সাংবাদিক ইরান সফর শেষে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ বিপ্লব সম্পর্কে নিজস্ব মূল্যায়ন প্রকাশ করেছেন।

তাঁদের মূল্যায়নগুলোই একত্রে গ্রন্থিত করা এ বইয়ের উদ্দেশ্য। তাঁদের মূল্যায়নের উপর প্রয়োজনবোধে সামান্য ক'টি ক্ষেত্রে পাদটীকার সাহায্যে আমাদের নিজস্ব মন্তব্য সংযোজন করেছি। আর বইয়ের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় শেষ তিনটি ফিচার সংক্ষিপ্ত করতে বাধ্য হয়েছি।

আমরা জালিমের উপর মজলুমের বিজয় কামনা করছি।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের
সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

www.pathagar.com

সূচী

সাপ্তাহিক বিচিত্রা ঃ

ইমামের ইরান ঃ
শাহাদত চৌধুরী ৫

সাপ্তাহিক স্বদেশ ঃ

যুদ্ধ ও বিপ্লবের দেশ ইরান ঃ
খন্দকার হাসনাত করিম ৩৩

দৈনিক দেশ ঃ

ইসলামী বিপ্লবের পরে
ইরানী মেয়েরা ঃ
শেখ মুহম্মদ নূরুল ইসলাম ৫১

দৈনিক বাংলার বাণী ঃ

তেহরান ডায়েরী ঃ
মীর নূরুল ইসলাম ৫৪

সাপ্তাহিক জাহানে নও ঃ

ইসলামী ইরানে দশ দিন ঃ
মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ৭৬

নিউজ লেটার ঃ

বিপ্লবোত্তর ইরান ঃ
অধ্যাপক সিরাজুল হক ১০১

www.pathagar.com

ইমামের ইরান

শাহাদত চৌধুরী

'ইনকিলাব রোড থেকে আজাদী রোড কত দূর ?'

প্রশ্নটা এসে গেল গাইডের কথা শুনতে শুনতে। এই রোডে এসে ভিড়তো জনতার মিছিল, ছোট ছোট দল। এই রোডে নামতো জনতার স্রোত।

এ রোডের নাম তখন ছিল রেজা শাহ রোড। পিতা, পাহলভী ডায়নেস্টীর প্রথম শাহের নামে নাম। ইনকিলাব স্কোয়ারে ছিল পুত্রের মূর্তি, আকাশ ছুঁয়ে। 'আরিয়া মেহের' উপাধি নিয়েছিলেন পাহলভী রাজবংশের দ্বিতীয় পুরুষ মোহাম্মদ রেজা পাহলভী। তিনি রাজপুত্র ছিলেন না, ছিলেন সৈনিক পুত্র; পিতাও রাজা ছিলেন না, ছিলেন সৈনিক। সৈনিক রেজা খান ২০০০ জনের কশাক বাহিনী নিয়ে তেহরান এসেছিলেন '২০ সালে, তেষট্টি বছর আগে। উৎখাত করেছিলেন কাজার রাজবংশের শেষ দাবীদারকে। হয়েছিলেন যুদ্ধমন্ত্রী, ২৩ সালে প্রধানমন্ত্রী, ২৫ সালে শাহেন শাহ। রেজা খান রেজা শাহ নাম নিয়ে বসেছিলেন ময়ূর সিংহাসনে। প্রতিষ্ঠিত হলো পাহলভী রাজবংশ। ৪১ সালে রেজা শাহকে ট্রেনে তুলে দিয়ে বৃটিশরা পুত্র মোহাম্মদ রেজাকে বসালো সিংহাসনে। পুত্র তার পরবর্তী স্মৃতিকথায় লিখেছিলেন : 'বন্ধুদের ধারণা হলো যে, আমিই পিতার সিংহাসন দখলে উপযুক্ত।' উপযুক্ত পুত্রই দ্বিতীয় পুরুষ হলেন আর্যশ্রেষ্ঠ। পিতার নামের রাস্তার প্রান্তে স্থাপিত হলো মূর্তি। রাস্তাটা চলে গেছে এয়ারপোর্টের দিকে। সেখানে নাম হলো শাহ-ইয়াদ—শাহ স্মৃতি রোড।

এ প্রতিবেদনের লেখক ইরান সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা বস্তুনিষ্ঠ। কিন্তু যেখানে বিপ্লবকে বিশ্লেষণ করতে গিয়েছেন সেখানে পাঠকদের আমরা সাবধানতা অবলম্বনের অনুরোধ জানাবো।

www.pathagar.com

শাহ-ইয়াদ তৈরী করেছিলেন আরিয়া মেহের মোহাম্মদ রেজা শাহ আত্ম-স্মৃতি প্রতিষ্ঠার জন্যে শুধু নয়, শাহেন শাহ পারসিক রাজবংশের ২৫০০ বছরের ক্রমোন্নয়তা ও উত্তরাধিকার ঘোষণার জন্যে। তাঁর পোষা ইতিহাসবেত্তারাও তাঁকে সাইরাস বংশের উত্তর পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন।

কিন্তু এই স্মৃতি-বেদীর নাম ফলক বদলে যেতে সময় লাগে নি। এখানে, এই বেদীর চারদিকে এসে দাঁড়িয়েছিল লক্ষ মানুষ। এখানেই এসে দাঁড়িয়েছিলেন ইরানের নতুন উত্তরাধিকার। একটি নির্দেশে তিনি কবর রচনা করেছিলেন রাজতন্ত্রের। তিনি ইমাম খোমেনী।

ইমামের ইরানেই আমি প্রথম এলাম। এবং প্রথমেই চোখে পড়েছিল স্মৃতিসৌধটি। শহরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে আছে। চোখে না পড়ে উপায় নেই।

এটাই তেহরানের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। এয়ারপোর্টে এসেছিলেন ইসলামিক বিপ্লবী কর্মী মোল্লা নজর। তিনিই বললেন, 'এটি এখন আজাদী স্কোয়ার ও রোড। ফ্রিডম রোড। আগে ছিল শাহ-ইয়াদ।'

আগের শাহ-ইয়াদ, এখন স্বাধীনতার প্রতীক।

ইরানের মাটিতে পা রেখেই অবচেতন অথবা সাংবাদিক সচেতনতায় চেয়েছি সত্তা বিভক্তি বা বিরোধ। একটি—খোমেনীর বর্তমান, দ্বিতীয়টি কি তা ছিল অনির্ধারিত। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে শাহকে দেখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনিভাবে শাহকে ইতিহাসের মোড়কে রাখা র‍্যাক থেকে নামিয়ে দেখাও সম্ভব নয়। তবে ২৫০০ বছরের ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড়াবে কে? শাহ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে একটি ক্ষণজীবী মুহূর্তে পরিণত হলেন, ২৫০০ বছরের ধারাবাহিকতায় নতুন সড়ক নির্মাণ করছে ইরানের জনগণ, না বদল হয়েছে শুধু নাম-ফলক?

সে উত্তর ইতিহাস দেবে আগামীতে।

তবে একটি মহান সত্য প্রথমে ঘোষিত হয়েছে ঃ স্মৃতির মিনারেই রচিত হয়েছে রাজতন্ত্রের কবর। ইরানের রাজতন্ত্রের ইতিহাস ২৫০০ বছরেই শেষ। আরিয়া মেহের মোহাম্মদ রেজা ছিলেন শেষ রাজা।

রাজার পতন হলেও আর্যাবর্তের নতুন আর্য কে অথবা কারা?

www.pathagar.com

আল্লাহ্-হু-আকব

আল্লাহ্ ওয়াহেদ, খোমেনী কায়েদ।
আল্লাহ্ এক, খোমেনী নেতা।
আল্লাহ-হু-আকবর, খোমেনী রাহবার।
আল্লাহ্ মহান, খোমেনী প্রদর্শক।

প্রথম রাতে হোটেলে কেবল বিছানা নিয়েছি। এ হোটেলটা ছোট। এককালে হয়তো কিছুটা জৌলুস ছিল। এখন নেই। নাম বদল এখানেও ঘটেছে। ছিল হোটেল এলিজাবেথ। ইংল্যান্ডের রাণীর নামে নাম। হয়তো রিসেপশন কাউন্টারে ইরানের শাহ শাহবানুর পাশাপাশি বা উপরে থাকতো রাণীর ছবি। এখন একজনেরই ছবি টাঙ্গানো আছে ঃ ইমাম খোমেনী। খোমেনীর কোন ছবিই এখন নেই যা স্বাভাবিক ফটোগ্রাফ। প্রত্যেকটি ছবিতে আনা হয় পারসিক শিল্পের ঐতিহ্যগত ডিভাইনিটি বা ঐশ্বরিকতা। পেছনে আলোর আভা, বিচ্ছুরণ যেন আকাশ থেকে নেমে আসা এঞ্জেল, অমানব। এমনি ছবি এয়ারপোর্টেও দেখেছিলাম। দেখেছি তেহরানের দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। হোটেল এলিজাবেথ এখন হোটেল বুলভার্ড। রাস্তার নামে নাম। রাস্তাটাও এলিজাবেথের নামে ছিল। এলিজাবেথ বুলভার্ড। এখন শুধু বুলভার্ড।

তেহরানকে সন্ধ্যায় পুরো দেখা হয় নি। দুবাই এয়ারপোর্টে দেখেছিলাম ইরানী তরুণীরা ইরানী প্লেনে ওটার আগে জিনস টি-শার্টের উপর চাপিয়ে নিলো চাদর। ঢেকে ফেললো মুখের হাসি, চোখের ব্রীড়া। আমাদের মধ্যেও প্রতিক্রিয়া হয়েছিল।

আল্লাহ-হু-আকবর।

হঠাৎ শুধু হলো শ্লোগান। উঠে বসলাম বিছানায়। শুনলাম মেশিনগানের ফায়ার। অন্ধকারে—ছ'তলার উপর থেকে কিছুই দেখা যায় না।

জানা ছিল জাতীয়তাবাদী সমাজতান্ত্রিক বা কম্যুনিস্টদের সঙ্গে সংঘর্ষ এখনো হয়। আমাদের সঙ্গে মাত্র একজনেরই পরিচয় হয়েছে তেহরানে আসার পর। মোল্লা নজর। তিনি ডাইনিং রুমে বলেছিলেন 'ইনশাআল্লাহ্ সব মুনাফেকদের' খতম করা হয়েছে। তবে এত গুলি কিসের ?

ফোন করলাম রিসেপশনে।

www.pathagar.com

ওরা বললো, আজ ২২শে সেপ্টেম্বর। এ দিন সাদ্দামের সৈন্যরা ইরান আক্রমণ করেছিল। তেহরানের জনগণ—প্রতিরোধের শপথ নিচ্ছে।'

আমরা এসেছি ইরান সরকারের আমন্ত্রণে ঃ হপ্তাহ-এ-জঙ্গ উপলক্ষে ইরানের প্রধান সমস্যা এখন যুদ্ধ।

আমাদের কৌতূহল সমগ্র ইরান।

সে রাতের শ্লোগানগুলোর আল্লাহ-হু-আকবর ছাড়া অন্যগুলো বুঝতে সময় লেগেছিল আরো একটি দিন।

শিয়া জামাত

২৩শে ডিসেম্বর ছিল শুক্রবার।

হোটেলের কাছেই ইনকিলাব স্কোয়ার। স্কোয়ারের মাঝখানের বেদীতে ছিল শাহের মূর্তি। জনগণ উপড়ে ফেলে দিয়েছে। এখন ওখানে নতুন ভাস্কর্য ক্যালিওগ্রাফির সৌকর্য। লেখা ঃ আল্লাহ-হু-আকবর। স্কোয়ার থেকে বাঁ দিকে এগুলেই বিশ্ববিদ্যালয়। এখানেই হয় শুক্রবারের জামাত। জামাত শুরু হয় সাড়ে ন'টা থেকে। গাইড জানালেন, ইসলামিক আইন অনুসারে একটি লোকালয়ে জামাত হওয়া উচিত একটিই। সে হিসেবে জামাত একটিই হয়। তেহরান যেহেতু রাজধানী সে জন্যেই এটি দেশের প্রধান জামাত। এখানে ইমাম প্রেসিডেন্ট স্বয়ং অথবা তাঁর প্রতিনিধি। সেদিনের জামাতে ইমাম ছিলেন স্পীকার রাফসানজানী। তার আগে বক্তব্য রাখলেন স্থল বাহিনীর প্রাধন কর্ণেল সিরাজী।

জামাতে যাবার আগে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ইসলামিক রিপাবলিক নিউজ এজেন্সীর অফিসে। অফিসটি অবস্থিত একটি ছোট রাস্তায়। রাস্তায় গাড়ী চলাচল নিষিদ্ধ। রাস্তায় ইতস্তত দাঁড়িয়ে অটোমেটিক গান হাতে কিশোর-তরুণ, বটল-গ্রীন লেবাসধারী গার্ড। এরাই ইরানের ইসলামী গার্ড। সবার মুখে খোঁচা খোঁচা দাঁড়ি। সবার চেহারাই যেন এক।

নিউজ এজেন্সী অফিসে আমাদের ছবি তোলা হলো। তৈরী হলো পরিচয়পত্র।

www.pathagar.com

এ পরিচয়পত্র ছাড়া সব প্রবেশদ্বারই বন্ধ। তা ছাড়া ছবি, কাউন্ট কপি রাখা হলো ফাইলে।

যিনি আমাদের গাইড তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার পরিচয়পত্র আমার পাসপোর্ট—এটাই তো যথেষ্ট—নাকি ?

গাইড বললেন, 'আমাদের অনেক ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে বলেই এতো সাবধান হতে হয়।'

নিউজ এজেন্সীর অফিসেও প্রবেশ নিষেধ। প্রতিটি কর্মীকেই দেহ তল্লাশী করে ঢুকতে দেয়া হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন উদয় হতে পারে, ঘটনা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক। কে কাকে চেক করছে। পক্ষ কে, প্রতিপক্ষই বা কে ? ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু কোথায়, উৎস কোথায়।

প্রশ্নটা করেছিলাম পরে একজনকে। প্রশ্নটা ছিল ঃ তোমরা গুরুত্বপূর্ণ পদে আছো। কিন্তু প্রতিটি স্তরে চেক করা হচ্ছে। চেক যে করছে সে কার পক্ষ থেকে করছে—সরকার, পার্টি বা বিশেষ বিভাগ থেকে ?'

'এটা ওরই দায়িত্ব।' ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'এখানে আমরাও কনফিউজিড থাকি ক্ষমতা কার হাতে। একটি অফিসে সবাই সবার মত ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছেন। কিন্তু তরুণ হিজবুল্লাহ্ যে খবর দেবে নির্দেশ না হলেও পরামর্শ যা দেবে, তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে হবে সবার। এই তরুণ ইসলামী বিপ্লবের রক্ষক।'

একজন বাংলাদেশী রসিকতা করে বলেছিলেন, 'যার শার্টটি যত পুরনো বা ময়লা তিনিই তত ক্ষমতাবান।' এটি অবশ্য অস্ত্রহীনদের বেলায় প্রযোজ্য। অস্ত্রধারীদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এ ধরণের শ্রেণী বিভাগ আছে। কিন্তু কিভাবে তা বোঝা যায় না। এদের চলাফেরা অবিন্যস্ত, একটি দুর্ঘটনা না ঘটলেও মনে হয় এই বুঝি গুলি বর্ষিত হবে।

জুমার জামাতে তিনবার তল্লাশী করার পর নেয়া হলো পনেরো ফুট উঁচু ডায়াসে। এখান থেকে বিশ গজ দূরে আর একটি বক্স-এর মতো স্টেজ। বক্তব্য রাখছেন সেদিনের ইমাম স্পীকার রাফসানজানী। তাঁর হাতে একটি অটোমেটিক রাইফেল।

জামাতের লোকসংখ্যার একটি অনুমান নোটে লিখেছিলাম।

www.pathagar.com

স্তু অংকটা ঠিক নয়। পরে যখন জামাতের ভেতর দিয়ে অন্য াস্তে যাই তখন সংখ্যাকে তিনগুণ মনে হয়েছিল, রাস্তায় এসে আরো বেশী। অনেক লোক আরো দূরে বসেছিল ছায়ায়, কবি সাদীর মূর্তির নিচে। প্রথম ভেবেছিলাম দর্শক, পরে দেখলাম তারাও নামাযী। গাইড স্টেজ থেকে দেখালেন, নিচে নামাযে বসেছেন আর্মি, নেভী, এয়ারফোর্সের প্রধানসহ লিবিয়ার নেভীর প্রধান। স্পীকার খুৎবা দিলেন দু'ভাগে। প্রথমভাগ রাজনৈতিক। এ বক্তৃতার সময় শ্লোগান উঠেছিল বারবার। দ্বিতীয় দফার খুৎবা শরীয়তী। এই দ্বিতীয় দফায় মানুষ দরূদ পড়ছিল শ্লোগানের মত করেই। সবাই একসঙ্গে সুর মিলিয়ে। গাইডকে বললাম, 'এই সংগবদ্ধতা কি আপনাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য? গাইড স্বীকার করলেন না, বললেন 'এটা হলো ইসলামের ঐক্য।' পরে বললেন, দরূদ কথাটাই ফার্সি। অনেক দরূদ পারসিক কবিরাও লিখে গেছেন। দু'একটা উপমা থেকে জানলাম এগুলি আমরাও পড়ি, জানি। আমার অন্যান্য বন্ধুদের না হলেও আমার একটি বিষয়ে কৌতূহল হলো: ইসলাম চর্চায় আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি তার অনেকগুলি ফার্সি। যেমন—নামায, রোযা, দরূদ ইত্যাদি। আরবীতে এসব শব্দ নেই। এদেশে ধর্ম প্রচারকরা এসেছিলেন পারস্য অঞ্চল থেকে। তারা তাদের ভাষাতেই ধর্ম প্রচার করে গেছেন। আমরা সে ভাষাই অনুসরণ করি, নিজের ভাষাতে না করে।

আমাদের দলের অনেকেই নামাযে দাঁড়ালেন। এখানকার জামাতও আমাদের জামাতের দৃশ্যগত বিভেদ আছে। টুপীপরা নামাযীর সংখ্যা একান্তই কম। অনেকেই আশে-পাশে ঘোরাফেরা করছে—নামাযে না দাঁড়িয়ে। সেজন্য রুকু সবকিছু বিন্যস্ত নয়। বিষয়টি ওদের কাছে তুলতে ওরা বললো, নামাযের জামাতে মানুষ ক্রমেই বাড়ছে। নামায পড়ার অভ্যাস শাহের আমলে কমে গিয়েছিল।

আমাদের মধ্যে যারা জামাতে দাঁড়িয়েছিলেন তাদের একজন নামায থেকে ফিরে অস্বস্তি প্রকাশ করলেন। কারণ নামাযের রীতি শিয়া রীতি।

এখানে উল্লেখ করা উচিত ইরানের শাসনতন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে শিয়া ইসলামই রাষ্টীয় ধর্ম। পরবর্তী বাক্যে হানাফী শাফেয়ী মালেকী হাম্বলী ও সাঈদী অনুসারীদের সম্মান প্রদর্শনপূর্বক রীতিনীতি পালনের স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

বহিরাগত মুসলিম সাংবাদিকদের প্রায় সবাই সুন্নী মতাব হওয়ায় গাইডের নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়।

প্রশ্ন ঃ আপনারা ইসলামিক রেভ্যুলেশন এক্সপোর্ট করতে চান ৫ কি শিয়া ইসলাম ?

উঃ না, ইসলামের প্রাথমিক শর্তেই বিপ্লব হতে পারে। ত এখানে আমাদের রেভ্যুলেশন এক্সপোর্ট বিষয়ে বক্তব্য এখন ব হয়েছে। আমরা এখন বলছি ইসলামিক রেভ্যুলেশন কোথাও ঘট আমরা সমর্থন করবো।

প্রঃ ইসলামিক শব্দটি ন্যাশনালিজম অর্থে ব্যবহার হচ্ছে কি ?

উঃ না। আমরা জাতীয়তায় ইরানী কিন্তু প্রথমে মুসলমান।

প্রঃ ইরানী মুসলমান ?

উঃ আগে মুসলমান।

প্রঃ আরবীরাও মুসলমান ?

উঃ খাঁটি মুসলমান নয়। সাদ্দাম হোসেন রাশিয়া-আমেরিকার দালাল আর যারা রাজা-বাদশা তারা মুসলমান হতে পারে না। ইসলামে রাজতন্ত্রের স্থান নেই।

তাদের মতে, শিয়া মুসলমানরা অন্যান্য মত থেকে বিচ্ছিন্ন নানা দিক থেকে। তার মধ্যে একটি হলো ইমামতের দর্শন। ইমামতের ভাব-মূর্তি তা হযরত মুহাম্মদের সাংবিধানিক, প্রশাসনিক এবং সামরিক কর্তৃত্বের উত্তরাধিকারই শুধু নয় তা আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সুন্নী ও শিয়ার মতাদর্শগত পার্থক্য যেখানে সেখানেই ইরানের শাসনতন্ত্রে বরখেলাফের প্রশ্নে রাজতন্ত্রের সঙ্গে ধর্মগুরুদের বিরোধ। সুন্নী মতে শাসককে চ্যালেঞ্জ করা যায় না যদি শাসক জুমার নামায আদায় করেন। শরীয়ত মেনে চলেন।[১]

বিষয়টি এভাবেই উল্লেখ করে একজন ইরানী বিপ্লবের কর্মী বললেন শিয়ারা সমঝোতাকে নাচক করে এসেছে সবসময় আর শহীদ হওয়াকে জীবনের পরম কর্তব্য বলে মনে করে। এই দুটিই ছিল

১. কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। কিছু কিছু সুন্নী এ কথা মনে করলেও সবার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয়। সুন্নীদের চার মাযহাবের ইমামগণের প্রায় সবাই মুসলিম শাসকদের দ্বারা নিপীড়িত হ'য়েছিলেন। মুসলিম খলীফার কারাগারেই শাহাদত বরণ করেছিলেন ইমাম আবু হানিফা।

www.pathagar.com

াদের বিপ্লবের উপাদান। এই কর্মীই উদাহরণ দিলেন ঃ

বিপ্লবের সময় দুটি শ্লোগান বেশ জনপ্রিয় ছিল। একটি—হর জ আশুরা, হর ময়দান কারবালা। দ্বিতীয়টি হলো—শিয়াদের হরাব রক্তরঞ্জিত মেহরাব। শিয়াদের ইতিহাস ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে ন্দ্বের রক্তাক্ত করুণ ইতিহাস।

অথচ ইরান কারবালার ঘটনার পর পরই শিয়া হয় নি। শিয়া মতাবলম্বী হয়েছে পরে। আব্বাসীয়দের শাসনাবসানে সাফাভিদ রাজবংশ রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। বর্তমান ইরানের ভৌগোলিক সীমায়, মুসলিম বিজয়ের পর প্রথম রাজবংশ সাফাভিদ। তখন সাফাভিদরাই তুর্কি অটোমান খিলাফত থেকে নিজেদের ভিন্নসত্তা আবিষ্কারের জন্যে, অথবা পারসিক জাতীয় সত্তা নির্ধারণের জন্যে জনগণকে বল প্রয়োগ করে শিয়া মতে দীক্ষিত করে এবং পন্ডিতের অভাবে সিরিয়া বাহরাইন থেকে আরব শিয়াদের আনা হয়। এরা রাজতন্ত্রের আশ্রিত হলেও পরবর্তী পর্যায়ে আলেমগণ কুরআন ও শিয়া-দর্শন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতায় নিজেদের অস্তিত্বের কথা বলেন। শাহ আব্বাসের সময় (১৫৮৭—১৬২৯) একজন আলেম শাহকে জানান রাজকীয় ক্ষমতা হলো ইমামের পক্ষ থেকে অর্পিত আমানত, তোমার উত্তরাধিকার নয়।

বিরোধের শুরু এখান থেকেই।

কাদের বিপ্লব

রাজতন্ত্রের শোষণের ইতিহাস কি একমাত্র প্রতিপক্ষ আলেমরাই? ডঃ মুসাদ্দেক কি ছিলেন? কেন জন্ম হয়েছিল মুজাহেদীন খাল্‌ক বা ফেদাইন-এ-খাল্‌ক অথবা তুদেহ পার্টি। এসব পার্টির ইতিহাসও তো লড়াইয়ের এবং আত্মত্যাগের ইতিহাস।[২]

২. ইরানের ইতিহাস একটু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে রাজতন্ত্রের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন আলেমরাই। ১৮৯২ সনের 'তামাক আন্দোলন' এবং ১৯০৫—১১ সনের শাসনতান্ত্রিক আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণরূপে আলেমদের। ডঃ মুসাদ্দেকের আন্দোলনের পেছনেও সিংহভাগ শক্তি যোগিয়েছিলেন আলেমরা।

www.pathagar.com

একটি ছেলে জুমার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়ে নামাযী কাছে একটি বই বিক্রি করছে। চিৎকার, ফেরী করার মত অনে কথা বলছে। প্রথম জনকে দেখে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল—বিক্রে ছাড়া কিছু ভাবা যায় নি। কিন্তু দ্বিতীয় মোড়ে আর একজনকে দেখলাম। দুজনের পোশাক এক। আমাদের ইরানী সঙ্গী মোল্লা নজরকে জিজ্ঞেস করলাম, এরা কি বই বিক্রি করছে?

মোল্লা নজর হাসলেন, এরা কয়েদী। জেল থেকে আনা হয়েছে। বিক্রি করছে বিপ্লব বিরোধীদের আত্ম-সমালোচনা।

'ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'

'অবশ্যই।

ছেলেটির নাম মুর্তজা ইত্তেকাদি। বয়স ২০। একাদশ শ্রেণীতে পড়ার সময় গ্রেফতার করা হয় বিপ্লব বিরোধী কার্য-কলাপের জন্যে। তিন বছর জেল খেটেছে। আরো দু'বছর পরে মুক্তি পাবে।

তিন বছর মানে শাহের পতনের পর গ্রেফতার করা হয়। কথাটা জিজ্ঞেস করাতে মোল্লা নজর বললেন, 'এরা প্রতি বিপ্লবী।'

ছিলেটিকে জিজ্ঞেস করা হলো—জেল থেকে বের হয়ে কি করবে?

'ইমাম খোমেনীর আহ্বানে যুদ্ধ করবো।' মোল্লা নজর ওর বক্তব্য অনুবাদ করলেন।

জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কোন পার্টি করতে বিপ্লবের সময়?

ছেলেটি মোল্লা নজরের দিকে তাকালো। মোল্লা নজরই উত্তর দিলেন, 'মুনাফেকীনদের সঙ্গে ছিল।'

'মুজাহেদীন খালাক?'

'হ্যাঁ, আমরা বলি মুনাফেকীন।' মোল্লা নজর বললেন।

কথাটা রাতেই আবার তুলেছিলাম একজন দোভাষীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে। '৫৩ সালে ডঃ মুসাদ্দেকের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকেও এরা এমন ছোট চোখে দেখে। তার আগে এবং পরে তুদেহ পার্টির কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সন্দেহ করা হয়। অথচ আটাত্তরে শাহের বিরুদ্ধে লড়াই'র শুরুতে ইরানী জনগণকেই আহ্বান জানানো হয়েছিল। সর্ব-স্তরের মানুষ যোগ দিয়েছিল। বিপ্লবের প্রধান দুর্গ ছিল বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

তে ছিল মূলত ফেদাইন ও মুজাহেদীনদের প্রাধান্য।[৩]

অস্বীকার করলেন না আমাদের দোভাষী। তিনি তাঁর বক্তব্য রাখ- া নিজের কথা বলে—'আমার এখানকার বয়স ত্রিশ। '৭১ সালে বিশ্ব- ্যালয়ে ভর্তি হই। তার আগেই আমি গুপ্ত সংগঠন হিজবুল্লাহ্‌র স্য হই। আমাদের গ্রুপটির নেতা ছিলেন আমাদের স্কুলের শিক্ষক। তিনি পরে পাকিস্তানে এ্যামবাসেডর হন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমে ড়ি এক বছর। তখন পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়ের সংখ্যা ছিল ১২০০ জন। এতজন মেয়ের মধ্যে চাদর ব্যবহার করতো দশ কি বারোজন হাতে গোনা মেয়ে, বাকিরা গাউন বা জিনস টি-শার্ট পরতো। শাহ এ সময় ছাত্র-ছাত্রীদের মিলিত ক্যাম্পিং করার জন্যে উৎসাহিত করতো, ছাত্র-ছাত্রীরা কাস্পিয়ান সৈকতে চলে যেতো। ক্যাবারে, নাইট ক্লাবে ভরে গিয়েছিল তেহরান। তরুণরা মদ্যপান করতো। এসব আমরা পছন্দ করতাম না।'

তবে পছন্দ কারা করতো ?

'করতো—যারা বড়লোক। যারা উচ্চ-মধ্যবিত্ত' ইসলাম ভুলে পাশ্চাত্য শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিল তারা।'

তুদেহ, ফেদাইন, মুজাহেদীন—সবাই হোয়াইট রেভ্যুলেশনের প্রভাবে উদভ্রান্ত সমাজের বিরুদ্ধে ছিল।[৪] তারপরও ছিল এসব দলের

---

৩. ডঃ মুসাদ্দেকের আন্দোলনকে ছোট চোখে দেখার কারণ ইসলাম ও আলেমদের প্রতি তাঁর বিশ্বাসঘাতকতা। যার ফলে '৫৩ সালে সি, আই, এ, কর্তৃক সংঘটিত অভ্যুত্থানের পর মুসাদ্দেকের সমর্থনে জনগণ আর রাস্তায় নামে নি। অথচ '৬৩ সালে ইমাম খোমেনীকে গ্রেফতার করার সাথে সাথে জনতা রাস্তায় নেমে পড়ে এবং ১৫,০০০ লোক অকাতরে প্রাণ বিলিয়ে দেয়। ফেদাইন, মুজাহেদীন বা তুদেহ্ পার্টি কিম্বা জাতীয়তাবাদীরা কোনকালেই ইরানী জনগণের উপর প্রভাবশালী ছিলো না। এগুলো সবসময়ই ছিলো গণ-বিচ্ছিন্ন সংগঠন এবং বিদেশী মদদপুষ্ট।

৪. সমাজতান্ত্রিক আদর্শের কারণে এরা শাহ্-বিরোধী ছিল। এ কারণেই তারা জনগণের সাথে মিশে আন্দোলন করেছে। কিন্তু এদের আবেদন-আহ্বান জনগণ কখনোই বিশ্বাস করেনি। ফলে এইসব সংগঠন পাশ্চাত্য-শিক্ষিত লোকদের একটা অতি-ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমিত ছিল।

www.pathagar.com

নিজস্ব অর্থনৈতিক প্রোগ্রাম, রাজনৈতিক কর্মসূচী। আমাদের বং বললেন, 'ওরা' বিপ্লবের প্রথমদিকে একসঙ্গে লড়াই করেছে, আমাদে ভাই বলেছে প্রথম প্রথম, কিন্তু আমরা কম্যুনিস্টদের সংগে কিভাবে ঐক্যের কথা বলি? ওরা ইসলামের বিরোধী। সে জন্যে আমর সময় নিয়েছিলাম ওদের পাল্টা আঘাত করার জন্যে। '৮১ থেকে তা করা হয়েছে।

ধর্মগুরুদের সঙ্গে বিরোধ শাসকের অনেক দিনের হলেও ধর্ম-গুরুরা ধর্মীয় সমস্যা বা ইস্যু নিয়ে এগিয়ে আসেন নি—অন্তত '৪১ '৪৮, '৫৩, বা '৬৩ সালে নয়। ঐতিহাসিকভবে কিছু বিতর্কের কথা শোনা যায়। ৪১, ৪৮, বা ৫৩, সালে নেতৃত্বে ছিলেন মূলত জাতীয়ত-বাদীরা। ইমাম কাশানী '৫৩ সালে ডঃ মুসাদ্দেককে সমর্থন দিয়ে-ছিলেন। '৫৩ সালে খোমেনীর বয়স ৫৩--কিন্তু এ সময় তাঁর নাম কোথাও আসেনি কেন প্রশ্নটাও ওঠে। '৪১ সালে রেজা খানের পতন, '৫৩ সালে অভ্যুত্থানের সময় ইমাম খোমনীকে প্রকাশ্য ভূমিকায় দেখা যায় নি। এ সম্পর্কে ইমাম খোমেনী দুঃখ প্রকাশ করে বলেছিলেন, আমার শুরুটাই হয়েছে দেরীতে।[৫]

খোমেনীর নাম সবাই জানে '৬৩ সালে। পাকিস্তানের জন্যে তখন প্রেসক্রিপসন দেয়া হয়েছিল সবুজ বিপ্লবের, ইরানের জন্যে শ্বেত বিপ্লব। কৃষি অর্থনীতিকে নতুন ছাঁচে সাজানো হয় এ পরিকল্পনার মাধ্যমে। যার আসল উদ্দেশ্য ছিল কৃষিভূমি, রাজ-পরিবার ও তার তোষামোদ-কারীদের হাতে আনা। কৃষির ভিত্তিকে ধ্বংস করে দেশকে মার্কিন মুখাপেক্ষী করা। কারণ রাজ পরিবার ও তোষামোদকারীরা মূলত ছিল

৫. '৩৯ সালেই ইমাম খোমেনী 'কাশফ-আল-আসরার' (গোপন তথ্য ফাঁস) গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে আপোষহীন সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন। এতে তিনি লিখেছিলেন, 'ঐ মূর্খ সৈনিকটির (রেজা খান) মগজ থেকে যত অর্থহীন শব্দ বেরিয়ে এসেছে সেসব নির্মূল করতে হবে এবং একমাত্র আল্লাহ্‌র আইনই টিকে থাকবে এবং তা কালের ধ্বংসকে প্রতিরোধ করবে।' অবশ্য এর পর থেকে '৬৩ পর্যন্ত নীরব থেকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন একদল সংগ্রামী আলেম যাঁরা বিপ্লবের নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন।

www.pathagar.com

রাষ্ট্র ও ইউরোপের কৃষি পণ্য বিক্রেতাদের সহযোগী। ইমাম খোমেনী '৬৩ সালে ভূমি সংস্কার করার ফলে কৃষকরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার সম্পর্কেই ফতোয়া দেন। অন্যান্য ফতোয়া ছিল—আমেরিকানদের ইরানী আইন থেকে অব্যাহতি দান, ইসরাইলের সঙ্গে বেশী দহরম-মহরম। এসব ফতোয়াকে ধর্মীয় বলা যায় না, বলা যায় ইরানী জনগণের রুজি-রুটি ও আত্মচেতনা বিষয়ক ফতোয়া।[৬] এর পেছনে মূল বিষয়টি রাজতন্ত্রের উৎখাত। অন্যান্য মতাবলম্বীরাও এর প্রত্যেকটি বিষয়ের সংগে একমত ছিলেন।

এ বক্তব্য ব্যাখ্যা করলে দাঁড়াচ্ছে—৭৮-৭৯ সালের বিপ্লবকে ইসলামী বিপ্লব হিসেবে চিহ্নিতকরণ সঠিক কিনা? একে কেউ বলেছেন সংঘর্ষ, অরাজকতা, বিশৃংখলা, উন্মাদনা ইত্যাদি। আমরা বলতে পারি রাজ-পরিবারের প্রতি জনগণের আক্রোশ এবং অভ্যুদয়।

বিপ্লবের উত্তরাধিকার

হয়ার ডিড ইট অল গো রং?—শাহ
'হোয়েন ইউ ক্যান সি এ লিটল লাইট ইউ কানট স্ট্যান্ড দ্য

৬. ইসলাম সম্পর্কে একটু ভালো জ্ঞান থাকলে যে কেউ বুঝতে পারবেন যে ইসলামে রুটি-রুজি আর 'ধর্মীয়' এ দু'টোর মধ্যে ব্যবধান নেই। সবই ধর্মের আওতাভুক্ত। আর একজন আধ্যাত্মিক নেতা যখন পার্থিব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, তখন যে সেটাকে তাঁর গভীর আধ্যাত্ম-চেতনা থেকেই উদ্ভূত হয় এ বিষয়ে অন্তত ইরানী জনগণের মাঝে অস্পষ্টতা ছিলো না। এ কারণেই আমরা দেখি বিপ্লবের শ্লোগান গুলোকে, যেগুলো লেখক নিজেই উদ্ধৃত করেছেন, কারো পক্ষেই "অ-ধর্মীয়" আখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। এছাড়া '৬৩তে ইমাম খোমেনী শাহের বিরুদ্ধে প্রথম যে অভিযোগ এনেছিলেন সেটা হচ্ছে—সংবিধান লংঘনের, যাতে ইসলাম সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। দ্বিতীয় অভিযোগ ছিল—শাহের সিংহাসন আরোহনকালীন প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের। এতেও ইসলাম রক্ষার কথা ছিল। তৃতীয় অভিযোগ ছিল—শাহ কর্তৃক আমেরিকা ও ইসরাইলের পদসেবার। ভূমি সংস্কার বিষয়ে ইমাম খোমেনীর বেশী কিছু বলতে হয় নি, এমনিতেই জনগণ ওগুলোরে উপর ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

ডার্কনেস এনি মোর'—মেহেদী বাজারগানের এই উক্তিটি ইরান ত্যাগে পূর্বে শাহের প্রশ্নের উত্তর হিসেবে স্থাপন করা যায়। শাহ এবং রুলিং এলিটরা কিছু বুঝে ওঠার আগে সবকিছু ঘটে গেল। লক্ষ মানুষ নেমে এলো রাজপথে। জীবন দিল অকাতরে। '৭৮ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর, (যাকে বলা হয় ব্ল্যাক ফ্রাই-ডে) এক তেহরানে হত্যা করে ৪ হাজার ইরানীকে। এদের মধ্যে ৬০০ ছিলেন মহিলা। এ আত্মত্যাগের মধ্যেই মূলত ইরানী জাতীয় চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ পায়। এটাই শিয়া মুসলিম চরিত্র। মূলত রাজতন্ত্র উৎখাতের লড়াই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শুরু করেছিল। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় পালন করেছিল প্রধান ভূমিকা। এ সময় ইসলামী বিপ্লব কথাটা শোনা যায় নি।

---

৭. মার্কসীয় তত্ত্ব অনুযায়ী লেখক এখানে শ্রেণী সংগ্রামের কথা বলতে চেয়েছেন। লড়াই মধ্যবিত্ত শ্রেণী কখনোই শুরু করে নি, তাছাড়া লড়াইতে এদের অংশগ্রহণও ছিল দরিদ্র গ্রামীন মানুষের সংখ্যার চাইতে অনেক কম। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভূমিকা থাকলেও সেটাকে কোনক্রমেই প্রধান ভূমিকা বলা চলে না। বিপ্লবে সবচাইতে বেশী শহীদ উপহার দিয়েছে মাশাফ নগরী। এখানে নিশ্চয় তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় নেই।

এ ছাড়া এ বিপ্লবের সূচনা যদি ধরা হয় '৬৩, তাহলেও এতে প্রথম আত্মোৎসর্গকারীরা হচ্ছেন 'কোম' এর মাদ্রাসার সংগ্রামী আলেম ও ছাত্রবৃন্দের মার্চ মাসে আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর ভাষণের পরপরই এঁদের উপর হামলা চালানো হয়। '৭৮ এ জালেহ স্কোয়ার (বর্তমানে আজাদী স্কোয়ার) এ প্রায় অর্ধ কোটি লোকের সমাবেশে যে ইশ্তেহার পাঠ করা হয় তাতে সুস্পষ্টভাবে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথাটি ছিল বিপ্লব বিজয়ের পর 'ইসলাম' কথাটি এসেছে, এটা মোটেও ঠিক নয়। বরং সর্বক্ষেত্রে, প্রায় সর্বমুহূর্তে, এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আলেমরা, কিয়ানুরী বা রাজাভী নয়। বিপ্লবের অন্যতম তাত্ত্বিক নেতা ডঃ আলী শরীয়তি প্রথাসিদ্ধ আলেম না হ'লেও পুরোপুরি ইসলাম ও ইমামের (ইমাম খোমেনী) অনুগত ছিলেন।

www.pathagar.com

বিপ্লব শুরু হয়েছে বিজয়ের পর।

একজন বাংলাদেশী বিপ্লবের সময় তেহরান ছিলেন। তিনি বললেন, লড়াই সবাই করেছে, পশ্চিমা শিক্ষিত মেয়েরাও করেছে, কম্যুনিস্টরা করেছে, জাতীয়তাবাদীরা করেছে, ধর্মীয় নেতারাও করেছে। কিন্তু সবার মনে সন্দেহ ছিল শাহ চলে যাবার পর কি হবে? ইরান কোথায় দাঁড়াবে? তৃতীয় বিশ্বে অন্যান্য দেশের ক্ষেত্রে পরবর্তী অবধারিত ঘটনা ছিল সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখল। কারণ তারাই একমাত্র সংগঠিত একক সম্প্রদায়। ইরানের সেনাবাহিনীর সে যোগ্যতা বা সাহস ছিল না। তারা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল জনগণের সঙ্গে। শাহের পলায়নে তারা ছিল বিভ্রান্ত। দ্বিতীয় সংঘঠিত সম্প্রদায় ছিল এই ধর্মীয় সম্প্রদায়। এরা ভেতরে ভেতরে রাজনৈতিকভাবেও তৈরী হয়েছিল। আমি অফিস আদালতে কর্মরত অনেক কর্মচারী দেখেছি যারা '৭৮-এর আগে গোপন সংগঠন হিজবুল্লাহ্‌র সদস্য ছিলেন।[৮] সবচেয়ে বড় কথা শাহ বিদায় হবার পর জাতীয়তাবাদী বা উদারপন্থীদের দ্বিধার মধ্যে খোমেনীর ইস্পাত ব্যক্তিত্ব সবাইকে ছোট করে দিয়েছিল। এছাড়াও দুটে ব্যাখ্যা আমি করে থাকি। প্রথমত অসংখ্য আত্মবলীদানকে জাতীয়তাবাদী বা সমাজতান্ত্রিক, কেউ মহত্ত্বদান অথবা ঐশ্বরিক করতে পারেন নি। তখন ইরানের ঘরে মৃত্যুর শোক—অথবা আত্মাহুতির উন্মাদনা চলছে। এ সময় এসব মৃত্যুকে ইমাম খোমেনী বেহেস্তের মহিমা দিলেন। মৃত্যু ক্ষেত্রে শিয়াদের কাছে আধ্যাত্মিক যুক্তিই একমাত্র গ্রাহ্য। দ্বিতীয়ত মধ্যবিত্তের বেড়া ডিঙিয়ে সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষেরা শ্লোগান তুলেছে। আন্দোলন চলে গেছে শিক্ষিত শ্রেণীর হাত থেকে গরীব মানুষের হাতে, খোমেনী যাদের বলেন মুস্তাজেব। অন্যদের বলেন, তাকদি। একদিকে সর্বহারা, অন্যদিকে বড়লোকেরা, যারা খোমেনীর ভাষায় শয়তানের অনুচর। শেষ পর্যায়ের লড়াই ছিল বড়লোক আর গরীবের। এখনো তাই। ওরা বলেন ধর্ম গরীবের পক্ষে।

---

৮. এই 'হিজবুল্লাহ'ই ছিল সর্বত্র সবচাইতে শক্তিশালী সংগঠন।' প্রাচ্য বা পাশ্চাত্যের প্রচার মাধ্যমগুলো 'তুদেহ', 'মুজাহেদীন' বা জাতীয়তাবাদীদেরকে যত শক্তিশালী ক'রেই দেখানোর চেষ্টা করুক না কেন খাঁটি কথাটি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও 'হিজবুল্লাহ্‌র চাইতে শক্তিশালী কোন সংগঠনই ছিলো না।

www.pathagar.com

তেহরান শহরের মাঝ বরাবর রাস্তাটির নাম এখন ইনকিলাব রোড। ইনকিলাব স্কোয়ারের উত্তর রাস্তাটি চলে গেছে বড়লোকদের অঞ্চলে—দক্ষিণ দিকে বাস সাধারণ মানুষের। দক্ষিণ থেকে মানুষ উঠে আসছিল সে সময় উত্তরদিকে। উত্তরের মানুষরা ভয় পেয়েছিল।

এখনো ভয় পায়।

২৪শে সেপ্টেম্বর গিয়েছিলাম যুদ্ধের উপর একটি একজিবিশন দেখতে। একজিবিশনে সামরিক উপকরণকে সহজভাবে, যুদ্ধকে, সাধারণ মানুষের অংশ গ্রহণকে, সহজ এবং জীবন-যাপনের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে। একজিবিশনের কমেন্ট লেখার খাতা রাখা ছিল। দেখলাম খাতায় একটি কিশোরী মেয়ে লিখছে, মা পাশে দাঁড়িয়ে দেখছেন। আমরা দাঁড়ালাম। দোভাষীকে বললাম, মেয়েটি কি লিখেছে দেখতে চাই। মেয়েটির লিখা শেষ হলে দোভাষী পড়ে শোনালেনঃ একজিবিশন উত্তর অঞ্চলে হচ্ছে কেন? এরা তো এখনো ঘুমিয়ে। দক্ষিণের মানুষদের জন্যে যানবাহনের ব্যবস্থা করা উচিত। তারা ইরানের বিপ্লবের সঙ্গে যেতে চায়।

উত্তর-দক্ষিণের বিরোধ অর্থনৈতিক বিরোধ, সংস্কৃতিক বিরোধ। উত্তরে জীবন-যাপন প্রণালী পশ্চিমা ঘেঁষা। দক্ষিণের 'বাজার' অঞ্চলেই আয়াতুল্লাহ্ বা ধর্মগুরুদের অবস্থান। এরাই বিপ্লবের রক্ষক। ইসলামী গার্ডে এদের ছেলেরাই অংশ নেয়।

'৬৩ সালে ছিল মাথাপিছু আয় ২০০ ডলার। '৭৮ সালে তা এসে দাঁড়িয়েছিল ২৫০০ ডলারে। এ থেকে বড় লোকদের জীবন প্রণালী অনুমান করা যায়। মধ্যবিত্তরা উত্তর-দক্ষিণ বিরোধে একটু দ্বিধান্বিত। বিদেশী টিভি বা ফ্রিজ কিনতে পারছে না, চাকরি ক্ষেত্রে নতুন বস হুকুম করছে, নৈতিকতা তদারক করছে, অন্য ব্যক্তি—বিষয়টি তার জন্যে গ্রহণযোগ্য নয়। বড়লোকেরা বেশীর ভাগ পালিয়ে গেছে। একজন হোটেল মালিকের কথা জানি যিনি পালিয়ে গিয়েছিলেন ফেরত এসেছেন, একা। ছেলেমেয়েরা ক্যালিফোর্নিয়াতে পড়াশোনা করে। তিনি হোটেলটি ফেরত পেয়েছেন—কিন্তু জমিজমা পান নি। একদা বিরাট ঐশ্বর্যের মালিক ছিলেন, এখন নিজেকেই হোটেল দেখাশোনা করতে হয়। স্বল্পভাষী, বিষণ্নভাবে বলেন ভাগ্যের কথা। দুপুরে দেখেছি হোটেল রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করতে।

www.pathagar.com

ওই হোটেলে পাউরুটি আমরা চাইলে পাই না—দেয়া হয় ইরানের ট্রাডিশনাল রুটি। কিন্তু ভদ্রলোকের টেবিলে দেখেছি তিনি টোস্ট-বাটার খাচ্ছেন ব্রিটিশ কায়দায়।

সিরাজী তরুণ। দেশ-বিদেশে থেকেছে। উচ্চাভিলাষ ছিল। এখন নেই। কারণ হিসেবে বলে ঃ 'কি হবে? আমি হিজবুল্লাহ্ ছিলাম না, বিপ্লবের সময় বাইরে ছিলাম।' ইরানে মদ পাওয়া যায় না কিন্তু সিরাজী মদ পান করে ঘরে বসে। অভ্যাস যাদের ছিল—তারা গোপনে করছে।

আমার ক্যামেরা দেখে ইরানীরা একাধিকবার জিজ্ঞেস করেছে বিক্রি করবো কিনা।

অনেকে ডলার কিনতে চায়। আমি জানাই ব্যাংক ছাড়া বিক্রি করবো না। আমাদের এক গাইড এক বন্ধের দিন ডলার চান। আমি ব্যাংকের কথা বলি। নিজেকে ভদ্রলোক বিপ্লব কর্মী বলে দাবী করেন তিনি। দোভাষী বলেন, ব্যাংকের চেয়ে বেশী দাম দেবেন। আমি দেখার জন্যে তাকে বিশ ডলার দেই। তিনি আমাকে দু'হাজার রিয়াল দেন। ব্যাংকে আমি পেয়েছিলাম ১৭৬০ রিয়াল। পরে জানি বাইরে বিক্রি করলে ৭০০০ রিয়াল পাওয়া যায় ২০ ডলারে। এ টাকা কেনে যারা বাইরে যেতে-চায় তারা।

জিনিসের দাম বেশী। আমাকে একটি শার্ট কিনতে হয় ২৫ ডলারে। যার দাম ঢাকায় ৭ ডলার। অবশ্যি ডলার ব্যাংকে না ভাঙিয়ে গোপনে ভাঙাল ওই দামই পড়তো তেহরানে।

তবে এই যুদ্ধের মধ্যেও ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবস্থা খুব সুন্দর। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিস সুলভে পাওয়া যায়। সমবায় দোকান থেকে কাপড় জুতো সস্তা। ওষুধের দাম ঢাকার চেয়ে বেশী নয়।

অফিস-আদালতে সবুজ পোশাক পরা ইসলালামী গার্ড কখনো অস্ত্র হাতে, কখনো খালি হাতে ঘুরছে। যত বড় অফিসারই হোক না কেন এ চোখ ঘুরালে বাকিয়া নার্ভাস হয়ে পড়ে। কেউ আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন ইসলামী গার্ড দেখলে তিনি থমকে যান।[১]

---

১. শাহের সময় যারা প্রশাসনে ছিলো তাদের মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছাড়া বাদ-বাকী সবাইকে এ প্রশাসনেও বহাল রাখা হয়েছে। তাদের পক্ষে বিপ্লবের সবকিছু সহজভাবে মেনে নেয়া স্বাভাবিক নয়, তরুণ রক্ষীরা তদারক করতে এলে তাদের পক্ষে বিব্রত বোধ করা অস্বাভাবিক নয়।

www.pathagar.com

সাধারণ মানুষের মধ্যেও একটি শব্দের ব্যবহার দেখলাম তা হলো 'ওরা।'

'ওরা বলতে কাদের তুমি চিহ্নিত করো?' একজনকে জিজ্ঞেস করছিলাম।

'কেন তুমি, চেন না?'

বিপ্লবের সংরক্ষক যে কেউ হতে পারে। তার সাফল্য বা ব্যর্থতা প্রমাণ হবে পরবর্তী সময়ে। বিপ্লবের উত্তরাধিকার-জনগণকে দিতে হয়।

কিন্তু এখানে 'ওরা' শব্দটি এলো কিভাবে?

ওরা কারা

'ওরা' উভয়পক্ষীয় হতে পারে। ইরানেও হয়েছে; তাই। এটা ছিল গণঅভ্যুত্থান। এখন এক বিশেষ শ্রেণী এর ভ্যান গার্ড।

ঢাকায়ও জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ 'ওরা কারা?'

যারা ক্ষমতায় আছেন তাদের কাছে 'ওরা' হচ্ছে পাশ্চাত্য অনুসারী আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণী। ওরা মূলত নাগরিক, চাকরিজীবী। 'ওরা'র মধ্যে যে শ্রেণীটি বিপ্লবের শত্রু শাহের আমলের লুটেরা। তারা এখন বিদেশে বা স্বদেশে বর্ণচোরা। কেউ কেউ তিনটি আমেরিকান গাড়ি গ্যারেজে রেখে বাইরে বের হন ইরানে নির্মিত করোল্লা নিয়ে। ছেলেমেয়েরা বাইরেই থাকে।

বিপ্লবের সঙ্গে আছেন কিন্তু ইসলামী গার্ড ইত্যাদির সমালোচক অনেকে। অনেকে বিদেশে বসে শাহের বিরোধিতা করেছেন, ইমাম খোমেনীর ছবি নিয়ে এ্যামবাসী ঘেরাও করেছেন—কিন্তু দেশে ফিরে হয়ে গেছেন 'স্মলম্যান'। শুধু চাকরি করে যাচ্ছেন। আর্মড ইসলামী গার্ড তাকে গার্ড দিচ্ছে। একজন ছিলেন ছাত্র, দুটো ভাষা জানতেন বলে বেশ উপার্জন করতেন। তিনি ইসলামী পন্থী, ডঃ আলী শরীয়তির ভক্ত পাঠক। তিনি বললেন, 'আমি বিপ্লবের ৭০ ভাগ সমর্থক। কোন অংশের সমর্থক নন তা বলতে চাইলেন না। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ থেকে বিবর্তনবাদ বাদ দেয়া পছন্দ নয়, পছন্দ নয় ডারউইনকে পাগল বলা।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বিভাগ খোলা হয় নি। চিকিৎসা ও কারিগরীর ক্লাস চলছে। কেন বন্ধ রাখা হয়েছে তার উত্তরে 'ওরা' বলে, পাঠ্যসূচী নির্ধারণ করা হচ্ছে। মানবিক বিভাগে মূলত পশ্চিমা রাজনীতি শেখানো হতো, তাদেরই লজিক ব্যবহার হতো, এখন হবে ইসলামিক। স্কুলের শিক্ষক বদল করা হয়েছে, নতুন বই লেখা হয়েছে। 'ছেলেরা এখন থেকে রাজার ইতিহাস পড়বে না, পড়বে জাতীয় ও জনগণের ইতিহাস।

আর একদল 'ওরা' বলে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ রাখা হয়েছে। তার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়েই 'মুনাফেকীনদের' আড্ডা। অর্থাৎ নতুন করে রাজনৈতিক কর্মকান্ড শুরু হতে পারে।

একজন আমাদের বললেন, মেয়েদের সঙ্গে একা কথা বলুন অনেক কথা পাবেন। ওরাই পরবর্তী বিপ্লবে পথে নামবে প্রথম।

নাসিমা আরবী, স্কুলের ছাত্রী। এ্যামেরিকান এ্যামবাসীর সামনে বসে ২৪শে সেপ্টেম্বর শপথ গ্রহণ করলো ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়ের ও সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিপাত কামনা করে। নাসিমা এসেছিল তেহরানে সব স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে। জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কিশোরী মেয়ে, এই চাদর পড়তে ভালো লাগে ?

'লাগে।'

'তুমি ইচ্ছে করে পরেছো, না তোমাকে পরতে বলা হয়েছে বলে পরেছো ?'

'নিজেই পরেছি। ইসলামের হিজাব নারীর সম্মান বাড়ায়।'

একই উত্তর পেলাম আরো কয়েকজন মেয়ের কাছ থেকে।

রাস্তায় এক শিশু বললো, তার তিন ভাই সাদ্দামের সঙ্গে লড়তে গিয়ে শহীদ হয়েছে।

'সাদ্দাম কে ?'

'মার্কিন, রাশিয়া, আর ইসরাইলের দালাল'—সবার মুখে এক কথা। যেন শিখিয়ে রাখা হয়েছে।

অন্য 'ওরা' কানে কানে বলে যাবে 'তুমি আর ক'জনের সঙ্গে কথা বলছো ! মানুষ চুপ করে আছে।'

www.pathagar.com

ইমাম খোমেনীর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, স ঘটনা ঘটাচ্ছে গরীব ঘরের সন্তানরা, অন্যরা শুধু দর্শক।[১০]

লাব্বায়েক খোমেনী

'ওরা' 'এরা' দুয়ের বিরোধ স্পষ্ট নয়। আমাদের কাছে ফ্যাক্টর বলে মনে হয় নি। কিন্তু যারা অনেকদিন ধরে ইরানে আছেন তাঁরা বলেন বিরোধ দানা বেঁধে উঠতো এতদিনে যদি যুদ্ধ না থাকতো।

যুদ্ধের 'ওরা' ভিন্ন। ওপক্ষ আরব, সেমেটিক, মরুভূমির সাপ খায়, বেদুঈন। এদিকের এরা আর্য, পারসিক। ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করে হযরত ইমাম হোসেনকে হত্যা করেছিল।[১১]

'আমরা ইমামের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবো না। আমরা আমাদের ভূমি উদ্ধার করবো, আল আক্সা যাবো, যাবো নজফ কারবালা হয়ে।' একজন বিপ্লব কর্মী বললেন, 'দুই মিলিয়ন ভলেন্টিয়ার সংগ্রহ করা হবে আক্সা উদ্ধারের জন্যে। 'লাব্বায়েক খোমেনী', আমরা হাজির খোমেনী' এই বাহিনীর নাম।'

বলা বাহুল্য জেরুজালেম যেতে হলে যেতে হবে ইরাক ও সৌদী আরবের উপর দিয়ে।

---

১০. মূলত দরিদ্র শ্রেণীটিই এ বিপ্লবের সাথে সবচাইতে একাত্ম, বিপ্লবের সুফল ওদের হাতেই পেঁাছুচ্ছে সবার আগে। প্রতিবিপ্লবী ও প্রতিক্রিয়াশীল 'ওরা' শুধু পাশ্চাত্য শিক্ষিতের মধ্যেই সীমিত। এ ছাড়া এ শ্রেণীর যাঁরা বিপ্লবকে সমর্থন করেন, তাঁরা অতটা আত্মত্যাগী হ'তে পারছেন না, যতটুকু সম্ভব হচ্ছে দরিদ্রদের পক্ষে।

১১. যুদ্ধটাকে এ ধরণের জাতীয়তাবাদী যুদ্ধ বলাটা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। ইমাম খোমেনী বারবার বলেছেন যে ইরাকী জনগণ আমাদেব শত্রু নয়, শত্রু হচ্ছে বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদ, যাদের হাতের পুতল সাদ্দাম। এ অনুচ্ছেদে যে কথাগুলো বলা হ'য়েছে সেইসব কথা ইমাম খোমেনী বা অন্য কোন নেতা ঘুণাক্ষরেও উচ্চারণ করেন নি। এমন কি ইরানের কোন লড়াকু শিশুও এধরণের কথা কক্ষনো বলবে না।

www.pathagar.com

ইরাক এ যুদ্ধকে বলছে দ্বিতীয় কাদিসিয়া। আরবের সঙ্গে পারসকদের লড়াই। ইরান বলছে নজফ কারবালার পবিত্র মাটিতে শহীদ হতে হবে।

তাই 'লাব্বায়েক খোমেনী।'

ঢাকায় ফিরে আসার পর এক বৃদ্ধ ধার্মিক উৎসাহে জানতে চাইলেন ধর্ম-কর্মের কথা। তখন একটু বিপদেই পড়তে হলো। ধর্ম-কর্মকে আমরা যেভাবে দেখি, সাংস্কৃতিকভাবে যেভাবে দেখে অভ্যস্ত ইরানে তেমন দেখা যায় না। সারাদিন প্রতি কথায় দরুদ পড়ছে, মিছিলে, বক্তৃতায়, বাসে যেতে যেতে একজন দরুদ বলে উঠলেই সবাই পড়ছে, বুকে চাপড় দিচ্ছে, যুদ্ধের শপথ নিচ্ছে, মনে হয় ধর্ম এখানে ঐক্য জিংগোইজম। রাজনীতির প্রয়োজনে—ইবাদত অর্থে নয়। অথবা ধর্ম তাদের জীবন-যাপন সংস্কৃতির সঙ্গে অতি সম্পৃক্ত—যাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। নামায আদায় করতে কম দেখেছি—যেমন আমাদের দেশে দেখা যায়। কিন্তু নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বাস, নেতার নির্দেশ, বিপ্লব কর্মীদের ইসলামী গাড'দের মোটিভেশন লক্ষ্য করার মত। কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে কাউকে তোয়াক্কা না করে। এবং কখনোই অবিনীয় নয়। আমরা রসিকতা করতাম ঃ সেই তত বিনয়ী যে যত বড় পদে আছেন। দেজফুলের জামাতের ইমাম বক্তব্য রাখলেন, ইরাকের বিরুদ্ধে, অন্যায় বোমা বর্ষণের বিরুদ্ধে, অত্যন্ত শক্ত ভাষায়—কিন্তু কন্ঠ একটুও তুললেন না। বড় বড় নেতারা কথা বলেন নিচু কন্ঠে।

আমরা ইরান অবস্থান করছিলাম 'হপ্তায়ে জঙ্গ, এর সময়। টেলিভিশনে পুরোটা সময় যুদ্ধ সঙ্গীত, বক্তৃতা বা যুদ্ধ দেখানো হতো। একদিন একটি অনুষ্ঠান চোখে পড়লো। চোখে পড়ার কারণ একজন মহিলা এলেন পর্দায়। তার পরনে শাড়ী।

অনুষ্ঠানটি ফরাসী টেলিভিশনের—এটি গ্রহণ করা হয়েছে ইরাকে। বিষয় ইরানের কিশোর যুদ্ধবন্দী। যা নিয়ে সারা পৃথিবীতে আলোচনা উঠেছে। এটাকে ইরানের বিরুদ্ধে প্রচার হিসেবে দেখানো হলেও ইরানী জনগণ এটাকে ইতিবাচক প্রচার মনে করেন। তাই পুনঃ প্রদর্শন করা হলো তেহরান টিভি থেকে।

দেখা গেল বেশ কয়েকজন কিশোর যুদ্ধ বন্দী বসে আছে। শাড়ী পরা ভারতীয় মহিলা এগিয়ে গেলেন। তিনি ফরাসী ও ইংরেজী জানেন। একটি ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কথা বলছো না কেন ?

www.pathagar.com

বালক উত্তর দিল, 'তোমার মাথার কাপড় নেই।'

'মাথার কাপড় দিলে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবে ?'

'হ্যাঁ'

মহিলা শাড়ীর আঁচল তুলে ঘোমটা দিলেন।

মহিলা ঃ তোমার বয়স কত ?'

বালক যোদ্ধা ঃ '১৬ বছর'।

কোন অঞ্চল থেকে এসেছো ?

'ইস্পাহান'।

'ইমাম খোমেনী বলেছেন– এই বালকরা আমাদের নয়, ওদের আমরা চাই না তুমি কি বলবে ?

এর উত্তর আমি দেবো না—এ রাজনীতির প্রশ্ন। তিনি আমাদের নেতা। তিনি বললে চলে যাবো। তিনি যা বলবেন তাই আমরা করবো।

'তুমি সিজ ফায়ার চাও' ?

'না। আমি চাই সত্যের জয় হোক।'

দ্বিতীয় বালকও এই উত্তর দিল।

যুদ্ধাহতদের সঙ্গে আলাপ করে একই উত্তর পাওয়া যায়। একজন কাঁদছিল শহীদ হতে পারেনি বলে।

ইরানের অবস্থান কালে এক এক সময় মনে হয়েছে ঃ মৃত্যুর জন্যেই জীবন। তিরাশি বছর বয়সের ইমাম বলেছেন, আল্লাহ্‌র ভালবাসাই মৃত্যু। সন্তান পিতা-মাতার নয়, ইসলামের ও আল্লাহ্‌র।

আমাদের বন্ধু মোল্লা নজর দু'বছর নিয়মিত বাহিনীতে ছিলেন– যা প্রত্যেক ইরানী যুবকের জন্যে বাধ্যতামূলক। তিনি আবার যাবেন ভলেন্টিয়ার হিসেবে। দেয়ালে দেয়ালে কারবালার স্বপ্ন।—'লাব্বায়েক খোমেনী।'

ইমামের দরবারে

তেহরানের উত্তর প্রান্তের একটি লোকালয় জামারান। নামটা বিশ্ব বিখ্যাত। এখানেই ইমাম খোমেনীর তেহরানস্থ আবাস।

প্রথম জানানো হয়েছিল ইমাম খোমেনীর দর্শন সম্ভব নয়। কিন্তু চব্বিশ তারিখ সন্ধ্যায় জানানো হলো আগামীকাল ইমাম খোমেনীর দর্শন মিলবে। আমাদের ক্যামেরা জমা দিতে হবে খালি করে। ফিল্ম

www.pathagar.com

ওরাই সরবরাহ করবে। ক্যামেরা পাওয়া যাবে ইমামের আবাসে সিকিউরিটি বিভাগে। ইমামের দেখা পাওয়ার বিষয়টি অনিশ্চিত। কেউ যদি পায় তা তাকে জানানো হয় কয়েক ঘন্টা আগে।

ভোর সাড়ে সাতটায় রওনা হলাম। বাসে বলা হলো আমাদের সঙ্গে কিছুই রাখা চলবে না—এমনকি ওয়ালেট, কয়েন, পেন্সিল কিছুই না।

তেহরানের উত্তর প্রান্তের রাস্তাগুলো তেমন প্রশস্ত নয়। গাড়ি আঁকা-বাঁকা পথে এগুলো। একজন বললেন, আমরা ক্রমেই উপরে উঠছি। এটি পাহাড়ী অঞ্চল। দেখুন গরমটাও কম।

বাসে আমাদের পরিচয়পত্রের সঙ্গে আরো একটি সিলযুক্ত কার্ড দেয়া হলো। ইমাম সাক্ষাৎ এর পাস। এটা ইস্যু করে ইমামের নিজস্ব দফতর থেকে। এক জায়গায় এসে একটি লাইন দেখতে পেলাম। আমাদের গাইড বললেন, 'ইমাম মাঝে মাঝে বিশেষ গ্রুপের সঙ্গে দেখা করেন। আজ করবেন শহীদ পরিবারের সঙ্গে।

নারী পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন লাইন। এরা শহীদ পরিবারের সদস্য।

আমাদের পরিচয় জেনে গাড়ী ছেড়ে দেয়া হলো। একজন উচ্চ পর্যায়ের ধর্মগুরু হেঁটে যাচ্ছিলেন, ড্রাইভার তাঁকে তুলে নিলেন। গাড়ী আরো একবার থামানো হলো। একটু দেখে যেতে পারমিশন দিলো। এসব গেটে পুলিশ বা আর্মি দেখলাম না। দেখলাম ইসলামী গার্ড। তৃতীয় পোস্টে এসে গাড়ী থেকে নামলাম। আমরা পকেটের সবকিছু একত্রে করে—বাসে ড্রাইভারের কাছে রেখে কার্ড দেখিয়ে তৃতীয় গেট পার হয়ে এগুলাম। এ, এফ, পি'র প্রতিনিধি বললেন, 'আমি এতোদিন আছি—আজ তোমাদের জন্যে দেখা করার সুযোগ পেলাম।'

চতুর্থ গেটে গিয়ে আটকে যেতে হলো। এবার একজন গার্ড ফোন করলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর একজন নেতা ধরনের গার্ড এলেন। গাইডের পরিচয়পত্র ও আমাদের তিন ধরনের পরিচয়পত্র দেখে ছাড়পত্র পাওয়া গেল। পঞ্চম গেটে একটা কাউন্টার। সেখানে সঙ্গে যা আছে জমা দিতে হয়। আমাদের একজনের সঙ্গে কয়েকটা কয়েন ছিল, তিনি তা জমা দিয়ে এলেন। এরপর একটি ঘরে দেহ তল্লাশী।

দেহ তল্লাশী শেষ হলে ঘর থেকে নামলাম একটি গলিতে। পুরনো

www.pathagar.com

শহরে ছোট গলি যেমন থাকে। দু'পাশের নানা ছাদের বাড়ী-ঘর। ইরানের পুরনো শহরের রীতি অনুসারে রাস্তার মাঝখানটায় ঢালু, ড্রেনের মত। রাস্তার নাম হালিম হোসেন স্ট্রীট। এ গলি দিয়ে একটু এগুতে দেখা গেল লোহার বার দিয়ে গলিটা বিভক্ত। লোক এসে লাইন দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা লাইনে না দাঁড়িয়ে গেটের কাছে এগিয়ে গেলাম ওখানে দাঁড়িয়ে দেখলাম চারদিকটা। ছাদে ছাদে বসানো এন্টি-এয়ার ক্র্যাফট গান। আমাদের গাইড বললো এই এলাকার উপর দিয়ে দেশী বিদেশী সামরিক বা বেসামরিক কোন ধরনের বিমানের উড়ে যাওয়া নিষেধ। কেউ গেলে বিনা নোটিশে ভূপতিত করা হবে। পঁচিশত লোক এর সিকিউরিটির কাজে নিয়োজিত আছেন।

আমাদের বিষয়টা নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে অনেক কথা হলো যার মানে আমাদের বলা হলো না।' তবে বুঝলাম অপেক্ষা করতে হবে। এখানে বুঝা গেল না কে কার উপর নির্দেশ দেবে।

এখানে বাংলাদেশ থেকে অনেকেই এসেছেন। গাইড বললেন' সম্প্রতি এসেছিলেন হাফেজজী হুজুর।

হাফেজজী হুজুরের কথা আমার স্থানীয় বাংলাদেশীদের কাছ থেকে শুনেছিলাম। তাঁর বক্তব্য এদেশের কাগজে বেশ ফলাও করে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলাদেশীরা বললেন, ইমাম নাকি তাঁর জন্যে সময় দিয়েছিল ১৫ মিনিট। কিন্তু হাফেজজী হুজুর ছিলেন অনেকক্ষণ। এবং ইমাম খোমেনী হাফেজজী হুজুরের পেছনে নামায পড়েছেন, কারণ তিনি বয়সে বড়।

আমাদের ভিন্ন লাইনে দাঁড়াতে বলা হলো। ইসলামী গার্ডের সদস্য আবার দেহ তল্লাশী করলেন। ভেতরের রাস্তাটা উঠে গেছে উঁচু হয়ে। রাস্তায় বিছানো উলের ছাই রঙ্গের কার্পেট। এখানে এসে জুতো খুলতে হলো। অথচ ইসলামী গার্ডদের পায়ে জুতো। আমাদের জুতো খোলার বিষয়টা হয়তো সিকিউরিটির কারণে। ক্যামেরা সংগ্রহ করলাম একটা ঘর থেকে। সেখানে ফিল্মও রাখা ছিল। বলা হলো হল ঘরের বাইরে ছবি তোলা চলবে না।

হল ঘরে ঢোকার মুখে লোকজনেরা তীক্ষ্ন চোখে পর্যবেক্ষণ করে ঢুকতে দিল।

চৌকো ঘর। সাত আট শত লোক বসতে পারে।

www.pathagar.com

ব্যালকনিতে মেয়েদের বসার ব্যবস্থা। ছাদটি প্রায় চারতলা সমান উঁচু। পনেরো মিনিটে ঘরটি ভরে গেল। আমরা সামনের দিকে। চিটি টিভি ক্যামেরা রাখা ছিল বিভিন্ন কোণে। অপারেটর সে ক্যামেরা চালু করলো। ঘরের এক পাশে ১২ ফুট উঁচু একটি ব্যালকনি। ব্যালকনির পেছনটায় লোহার দরজা। স্লাইড দরজা খুলে একজন ব্যালকনির হাতওয়ালা চেয়ারের কম্বলটা ঠিক করলেন। সাদা কাপড়টা ঠকঠাক করে আবার চলে গেলেন ভেতরে।

এদিকে উৎসাহী দর্শকরা ব্যালকনির দিকে চেয়ে বসে আছে। একটি সাত বছরের শিশু গান গাচ্ছে, অন্যরা মাঝে মাঝে কোরাস ধরছে।

ও পাশের দেয়ালে টাংগানো একটি ছবি। যার অর্থ যতদূর মনে হয় আল-আকসায় যেতে হবে নজফ কারবালা হয়ে। হঠাৎ খেয়াল করলাম ছবির নিচে এসে বসেছেন ঃ প্রেসিডেন্ট আলী খামেনী, প্রধান-মন্ত্রী ও ইরাকের একজাইল সরকারের মুখপাত্র আয়াতুল্লাহ্ হাকিম। ব্যালকনির নিচে এসে এটেনশন হয়ে দাঁড়ানো জনা দশেক ইসলামী গার্ড।

সকাল সাড়ে ন'টার দিকে দরজাটা খুলে গেল। ব্যালকনিতে এলেন ইমাম খোমেনীর পুত্র ও আর একজন। তারা একপাশে সরে দাঁড়ালেন।

তিরাশি বছর বয়সের ইমাম খোমেনী এসে দাঁড়ালেন। দু-হাত উঁচুতে—অনেক ছবিতে দেখা সেই পরিচিত ভঙ্গি। হলের ভক্তরা দরুদ পড়লো ইমামের নামে।

ইমাম বসলেন।

ফার্সীতে অনুচ্চ কণ্ঠে ভাষণ শুরু করলেন।

ইমাম খোমেনীর হাজার হাজার ছবি আর পোস্টার দেখেছি এ যেন আর একটি পোস্টার। সেই একই ভঙ্গি, একই অভিব্যক্তি, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত অবয়ব, জোড়া ভ্রুর ভেতর দিয়ে নৈর্ব্যক্তিক চাহনি। কথা বলছেন। ৪৫ ডিগ্রী ডায়মিটারে মুখটি একই সময়ের ব্যবধানে ডান থেকে বাঁয়ে, বাঁ থেকে ডানে নিচ্ছেন। আমি ক্যামেরায় চোখ রেখে একটি বিশেষ মুহূর্ত খুঁজছি। আমার ক্যামেরার প্রতিটি ছবি এক রকম ব্যবধান শুধু কোণের। আমি ইমাম খোমেনীর নতুন প্রেক্ষিত পাই নি।

www.pathagar.com

ইসলামের অবর্তমানে ইরা

ইরানের প্রধান সমস্যা এই যুদ্ধ।

ইরানী বিপ্লবের সঠিক রূপরেখা নির্ধারিত হবার অবসর না দিয়ে শুরু হয় কুর্দিস্থানের যুদ্ধ। আশি সালে ইরাকের আক্রমণ। এগুলো মূলত বিপ্লবের অনুষঙ্গ। বিপ্লবের সময় শাহের সেনাবাহিনী প্রা বিলুপ্ত হয়। এখন স্থল বাহিনীর প্রধান কর্ণেল সিরাজী। তার অধীনস্থ অনেকের পদবী জেনারেল। সেনাবাহিনী এখন মুখ্য নয়, ইমাম খোমেনী পুরো জাতিকে যুদ্ধের উন্মাদনার ভেতর নিয়ে গেছেন।

ইমাম খোমেনী শাসনতন্ত্রের প্রধান ব্যক্তি। তিনি প্রশাসনে বক্তব্য রাখেন না। বক্তব্য রাখেন জাতির উদ্দেশ্যে। বক্তব্য পৌঁছে যায় দেশের প্রতিটি অঞ্চলে জুমার জামাত নেতার মাধ্যমে। তিনি যেমন আধ্যাত্ম চেতনায় ইমাম, বক্তব্য যেন—পৌঁছে যায় জনগণের চেতনায়। এ চেতনা স্পর্শ করা কঠিন নয়। শিয়া চেতনায় ইমাম মেহেদীর আবাহন রয়ে গেছে। রয়ে গেছে আত্ম বিলুপ্তির প্রেরণা। এগুলোকেই জাগিয়ে তুলেছেন ইমাম। যা যুদ্ধের জন্যে হয়ে উঠেছে ইতিবাচক।[১২]

এখন দুটো প্রশ্ন ওঠে—যুদ্ধ শেষ হলে কি হবে এবং ইমাম খোমেনী না থাকলে কি হবে?

যুদ্ধ আছে বলে ভেতরের অস্ত্রের সংঘাতগুলো জনগণের রাজনৈতিক মতের অনুকরণে সহায়ক হয় নি। যুদ্ধ শেষ হলে কি সেই মেরুকরণের প্রক্রিয়া শুরু হবে? এতো অস্ত্র বের হয়েছিল, বিপ্লব ও যুদ্ধে এতো তরুণ নিয়োজিত হয়েছে, স্বাভাবিক অবস্থায় এরা কোথায় যাবে? উত্তরে এরা বলেন, শহর ছেড়ে আমরা কৃষির উপর জোর দিচ্ছি, গ্রামে গ্রামে অসংখ্য কর্মী প্রয়োজন হবে। এরা সেখানে যাবে।

অনেকে বলেন ইমাম খোমেনীর আবর্তমানে একটি ছোট সেল নেতৃত্ব দেবে। কিন্তু প্রচার দেখে মনে হয় আয়াতুল্লাহ্ মুন্তাজেরীকে সব ধরণের বিতর্কের ঊর্ধ্বে রাখা হচ্ছে ইমাম খোমেনীর স্থলাভিষিক্ত করার জন্যে। বিষয়টি তত সহজ হবে কিনা সন্দেহ আছে। ইমাম

১২. শুধু যুদ্ধের জন্যে নয় পরকালীন মুক্তির জন্যেও এ চেতনার উদ্বোধন ইতিবাচক।

www.pathagar.com

ামেনীর আঙুলের নির্দেশে জনগণ ওঠে বসে বলে ধর্মগুরু ম্প্রদায় পরস্পরে বিতর্কে নামছেন না।[১৩] যেমন বিপ্লবের প্রথম কের নেতা আয়াতুল্লাহ্ শরীয়ত মাদারীর আধ্যাত্মিক অনুসারীরা াজনৈতিকভাবে খোমেনীর সমর্থক হয়ে ওঠে। প্রতাপশালী খাল-ালি একটি গ্রুপ নিয়ে এখন প্রায় নীরবে মজলিসে বসেন। কারণ াজনৈতিকভাবে কিছুটা কোণঠোসা হয়ে আছেন। তুদেহ পার্টির কয়ানরী ও আন্যান্য প্রায় সব নেতা এখনো কিছুদিন পরপর টেলিভিশনের মাধ্যমে আত্মসমালোচনা করছেন। নিজেদের কেজিবির এজেন্ট হিসেবে সনাক্ত করেছেন সেই আত্ম সমালোচনায়। ফেদাইন ও মুজাহেদীন খালকের সাড়া-শব্দ কম। কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি। ইউনিভার্সিটি পুরোপুরি চালু হলে কি হয় বলা যায় না। জনগণকে এদের বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে এর পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ধারক। আমরা পুর্বের নই, পশ্চিমেও নই।

এই বিতর্ক শেষ হয় নি। শেষ হয় নি কারণ তার অবসর ইরানীরা পায় নি। পায়নি তার কারণ যুদ্ধ ও ইমাম খোমেনী।

তেহরানের ইনকিলাব রোড ধরে যাচ্ছিলাম পুরোনো শহরের বাজার দেখতে। ট্যাক্সিচালক ছেলেটির বয়স ষোল ব. সতেরোর বেশী হবে না। মুখে কেবল দাড়ি উঠেছে। বেশ চুপচাপ গাড়ী চালাচ্ছিল। হঠাৎ হেসে ফেলল। তার পাশাপাশি চলছে আরেকটি গাড়ী। গাড়ীর চালক এক মহিলা। বাতাসে তার মাথার কাপড় সরে গিয়েছিল। আমাদের ট্যাক্সির ড্রাইভারকে দেখে কাপড় টেনে দিল। কিশোরের হাসির কারণ সেটা। বললো, 'আমাকে বিপ্লবের লোক মনে করেছে।'

ছেলেটির নাম আলী। কথা বললো আমাদের সঙ্গে ইরান বেতারের বাংলা অনুষ্ঠানের ফরিদ ও ইসাক সাহেবের সাহায্যে।

আলীর বাবা গরীব ফল বিক্রেতা। ও চালাচ্ছে বন্ধুর গাড়ী, স্কুলে

১৩. ইরানের জনগণ এখন ব্যক্তি ও ইস্যুর মধ্যে পার্থক্য করা শিখে গেছে। যে জনগণ বনিসদরকে শতকরা পঁচাত্তর ভাগ ভোট নিয়ে নির্বাচিত করেছিল তারাই তাকে বিতাড়িত করে শতকরা ৮৭ ভাগ ভোটে নির্বাচিত করেছে আলী রাজাইকে। ইমাম খোমেনীর পর জনগণের সচেনতা হঠাৎ করেই ভোঁতা হয়ে যাবার সম্ভাবনা নেই।

www.pathagar.com

নাইনের ছাত্র, এটা অতিরিক্ত রোজগার। আলী বললো, তোমরা এ যুদ্ধে ইরাককে সমর্থন কর!' কেন এ কথা মনে করে জানতে চাইলে সে বললে, ইরাকী টিভিতে বাংলাদেশীদের দেখা যায়। সে অবশ্যি সরকারের সঙ্গে সরকারের সম্পর্কে বিশ্বাস করে না। যেমন জাপান আমাদের কাছে যুদ্ধের গাড়ী বিক্রির জন্যে ভাল কথা বলে, আবার ইরাকের কাছেও গাড়ী বিক্রি করে। এ যুদ্ধে লাভ হচ্ছে ওদেরই। সে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ঔপনিবেশিক, নয়া ঔপনিবেশিক শোষণ ইত্যাদি দিয়ে কথা তুলল। জিজ্ঞেস করা হল, তুমি মার্ক্সীয় শব্দ ব্যবহার করছ, তুমি কি ওদের সমর্থক।

'তাহলে রাফসানজানিও মার্ক্স-এর সমর্থক। তিনি গত শুক্রবারের জামাতেও এসব কথা বলেছেন।' ছেলেটি হসল। আরো হাসলো পাশের ট্রাকের ছেলেটির গান শুনে। গাড়ী ট্রাকের পাশে নিয়ে গিয়ে কি যেন বলল।

জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হল ?'

ওই ড্রাইভার শাহের আমলের গান গাইছিল।' আলী খুব হাসল।

ফরিদ সাহেবের সঙ্গে আরো কথা হল তার। আমি ফরিদ সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, কি বলছেন ?

ফরিদ সাহেব বললেন, 'বাচ্চা ছেলে। অনেক বক্তব্য আছে ওর। কিন্তু এখনো কিছু নির্ধারণ করতে পারছে না।'

আমার মনে হল ইরানে এখনো মানবিক বোধ আছে। শ্লোগান শহীদান, কারবালা বিপ্লবের বাইরেও মানুষ আছে। যারা সিদ্ধান্ত নিতে চায়, জিন্দাবাদ দেবার আগে দ্বিধায় থাকে।

এরা কারা ? আর্যাবর্তে সিংহাসন, রাজমুকুট এখন মিউজিয়মের বিষয়। ওটা আর কোনদিন ইরানে ফিরে আসবে না। ছোট জনপদ কিভাবে বৃহৎ শক্তিকে পদদলিত করতে পারে তা ইরান দেখিয়েছে। নজফ কারবালার স্বপ্ন এ ধরণের উন্মাদনা। মৃত্যুর বন্দনা করে জীবন চলে না।[১৪]

১৪. ইরানে যার বন্দনা চলে সেটা 'মৃত্যু' নয় বরং এ জীবনের পরবর্তী চির আনন্দময় চিরস্থায়ী জীবনের, যার তুলনায় এ জীবনের কোন অর্থ নেই, মূল্য নেই।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যুদ্ধ ও বিপ্লবের দেশ ইরান

খন্দকার হাসনাত করিম

রত্নগর্ভা পারস্য দেশ ছিলো দীর্ঘদিন দামেস্ক ও বাগদাদের বিদেশী শাসনের পদানত। অশিক্ষা, ক্ষুধা ও ব্যাধিতে পারস্য ছিলো জর্জরিত। মক্কা-মদীনায় নবীন ধর্ম ইসলামের প্রভাবে সেই তমসাচ্ছন্ন প্রাচীন পারস্য আবার জেগে উঠলো। নব জীবনের গান গেয়ে উঠলো পরাধীন পারস্যের বুলবুল। পারস্যদেশ আমন্ত্রণ জানালো আরবের যুক্তিবাদী দর্শন, গাইলো ইসলামের সাম্যের গান। ভারত থেকে আমন্ত্রণ জানালো উপনিষদের বাণী, শুষে নিলো গ্রীক ও মিশরীয় নিও-প্লেটোনিক মতবাদ। পারস্যে জন্ম নিলো মরমী সুফীবাদ। ঊষর মরুতে জন্ম নিলো ইবনে সিনা, আল ফিন্দি, ফারাবী, মহাকবি ফেরদৌসী, উমর খৈয়াম, সা'দী, হাফিজ, মাওলানা জালালউদ্দীন রুমীর মত কালজয়ী প্রতিভা।

গত নভেম্বর মাসে সেই পারস্য প্রতিভার দেশে যাবার সুযোগ পাই বাংলাদেশ থেকে আমরা চারজন সাংবাদিক। ৩০শে অক্টোবর ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে প্রায় দুই দিন যাত্রাবিরতির পর ১লা নভেম্বর ইরান এয়ারের বোয়িং-৭৪৭ যোগে আমরা যখন মেহেরাবাদ বিমান বন্দরে পেঁাছাই, বিপ্লবের শহর তেহরানের মানুষ তখনও ঘুম থেকে জাগে নি। উত্তর তেহরানে তখন বরফ পড়তে শুরু করেছে। কনকনে ঠান্ডার উপর উত্তরের হিমেল হাওয়া। বিমান বন্দরের সামনে যাত্রীদের ট্যাক্সিতে তোলা নিয়ে ড্রাইভারদের মধ্যে হট্টগোল পড়ে গেলো। বুঝলাম বহিরাগত যাত্রীরা এখানে খুবই লোভনীয়। ব্যাংক খুলবে সকাল ন'টায়। যাত্রীরা ডলার পাউন্ড কিছু না কিছু সাথে করে এনেছেন। লোভটা আসলে ওই কারণেই। বিমান বন্দর থেকে হোটেল। ভ্যালী আসর এভিনিউ-এর শেষ প্রান্তে সুসজ্জিত অত্যাধুনিক হোটেল কাওসার—সাবেক কিংস হোটেল। সকালে দেখা করতে এলেন ইসলামী গাউডেন্স এর কর্মকর্তারা।

www.pathagar.com

প্রথম দিনটি কাটলো অখন্ড বিশ্রামে। মার্কিন দূতাবাস দখলের বার্ষিকী উদ্‌যাপন প্রত্যক্ষ করতে আমাদের ইরানে আসা। ১৯৭৯ সাল থেকেই ইরান আমাদের অনেকেরই কৌতূহল ও আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। এই সুযোগে যুদ্ধ ও বিপ্লবের দেশটিকে খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ এসে গেলো। দ্বিতীয় দিনও কাটলো নানা আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার মধ্য দিয়ে। ৩রা নভেম্বর ইরাকের সর্বোচ্চ ইসলামী পরিষদের প্রবাসী নেতা আয়াতুল্লাহ্ হাকিমী তাবাতাবাইয়ের সাথে সাক্ষাৎকার। ৪ঠা নভেম্বর তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে জুমার নামাযের প্রধান জামাত। ইমামতী করছিলেন মজলিস (পার্লামেন্ট) এর স্পীকার আলী আকবর রাফসানজানী। কয়েক লক্ষ লোকের সমাবেশ। আশে-পাশের সব কয়টি বড় রাস্তা জুড়ে সারি সারি নামাযীরা সকাল থেকে বসে আছেন। মহিলা এবং শিশুরাও এসেছে। জুমা নামাযের খুৎবায় স্পীকার রাফসানজানী দেশের গত সপ্তাহের পরিস্থিতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করলেন। আমরা ৭২ জন বিদেশী সাংবাদিক ইমামের পাশের মঞ্চ থেকে প্রত্যক্ষ করছি সেই বিশাল সমাবেশ। লক্ষ মানুষের গুণ গুণ করে দরুদ পড়ার কোরাস ধ্বনি এক বিশাল জলপ্রপাতের মত বজ্র গম্ভীর অথচ হৃদয়গ্রাহী আওয়াজের সৃষ্টি করেছে। ময়দানের মাঝ বরাবর পরদা টাঙানো। বাম পাশে মেয়েদের জামাত। প্রায় দুই মাইল দূরে গাড়ী পার্ক করে পায়ে হেঁটে সবাই যোগ দিয়েছেন শুক্রবারের প্রধান জামাতে।

৫ই নভেম্বর গেলাম ইরানের পবিত্র নগরী কোমে। আয়াতুল্লাহ্ মুন্তাজারীর সাথে সাক্ষাৎকার এবং কোমের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন। এখানে লেখাপড়া শিখে আলেম হয়েছেন বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ্ রূহুল্লাহ খোমেনী। আজ থেকে ১৮২ বছর আগে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্মীয় শিক্ষা থেকে শুরু করে জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এখানে অধ্যয়ন করেন দেশ-বিদেশের ছাত্ররা। বাংলাদেশের বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র পড়াশুনা করছে কোম বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিদেশী ছাত্রের সংখ্যা ছয় হাজার। ইরানের ইসলামী বিপ্লবের পীঠস্থান এই কোম বিশ্ববিদ্যালয় একাধিবার শাহের গোপন পুলিশ 'সাভাক' দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের পর গোটা তেহরানে যে উল্লাস, কোমে তার ছায়াটুকু নেই। শান্ত স্নিগ্ধ একটা সমাহিত ভাব গোটা এলাকায়। পাশেই বিবি ফাতিমা আল-মাসুমার

www.pathagar.com

মাজার। ১৯৭৯ সালে এই শান্ত শহরটি এক অর্থে সমগ্র পৃথিবীকে কাঁপিয়ে তোলে।

৬ই নভেম্বর তেহরান শহরতলীতে হিসমতিয়া গ্যারিসনে ইরাকী যুদ্ধবন্দীদের দেখতে গেলাম। গ্যারিসন কমান্ডার কর্ণেল মাহমুদ বাকের তাহিদী। যুদ্ধবন্দীদের শ্লোগান ঃ "তাক্‌বীর—আল্লাহু-হু-আকবর"—"তাক্‌বীর খোমেনী রাহবার"—মার্গবাদ ইসরায়েল"—মার্গবাদ অর্থ নিপাক যাক—"মার্গবাদ আমেরিকা" মার্গবাদ সাদ্দাম" (সাদ্দাম হোসেন)। এক যুদ্ধবন্দীকে প্রশ্ন করলাম, নিজ দেশের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছো কেন? ভয়ে ভয়ে দিচ্ছো? তার উত্তর ঃ "সাদ্দাম হোসেন ইরাকের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমরা ইসলামী বিপ্লব চাই...খোমেনী আমাদের নেতা।" হিসমতিয়া সেনা ছাউনীতে যে সব ইরাকী যুদ্ধবন্দীকে রাখা হয়েছে তারা কি সবাই মন থেকে ইরান বিপ্লবকে সমর্থন করে, নাকি ভয়ে অথবা ভাল ব্যবহার পাবার আশায় ইরানের সমর্থনে ধ্বনি দিচ্ছে? যুদ্ধবন্দী ইরাকী সামরিক বাহিনীর ডাক্তার আবদুল বারীকে আমরা একান্তে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলাম। তার জবাব ঃ আমরা মুসলমান। ইসলামী বিপ্লবকে বিরোধিতা করা কোনো মুসলমানের উচিত নয়। আমরা কখনই মনে করি না, আমরা বন্দী। অফিসার ও জওয়ানদের এখানে একই সুযোগ-সুবিধা দেয়া হচ্ছে।" গ্যারিসন কমান্ডার বাকের তাহিদীকে প্রশ্ন করলাম, যুদ্ধবন্দীকে দিয়ে তার দেশের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে বাধ্য করা জেনেভা চুক্তির বরখেলাপ, আপনি তা মানেন? তাহিদী ঃ স্বেচ্ছায় যদি কোন বন্দী তা করে, তাহলে কি করে তাকে ঠেকাবো?" সেনানিবাসের দ্বিতীয় ব্লকে থাকেন যুদ্ধবন্দী (ডাঃ হাসান হামিদ) এক ১ম লেফটেনেন্ট। দেড় বছর আগে তিনি ইরাকের সেনাবাহিনীতে ডাক্তার হিসেবে যোগ দেন। হামিদ বললেন ঃ আমাকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হয়। আমি যদি অস্বীকার করতাম, তাহলে বাথিস্ট বাহিনী আমার পরিবারের উপর নির্যাতন করতো।

কর্পোরাল মোহসেন কাসিম এবং কর্পোরাল খালিদ জসিম—আরো দুজন কর্পোরাল ইরাকী যুদ্ধবন্দী। তারাও ইরাকী ক্ষমতাসীন বাথিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিচ্ছিলো। জিজ্ঞেস করলাম, ইসলামী ঐক্যের যদি আপনারা বিশ্বাসী হন, তা হলে এখানে আপনাদেরকে

www.pathagar.com

বন্দী করে রাখা হয়েছে কেন ? তরুণ সৈন্য কাসিম বললো, "এখানে বিপ্লবের সমর্থন করছি মনের তাগিদে, কিন্তু ইরান আক্রমণ করতে এসেছিলাম জীবন রক্ষার তাগিদে। অথচ কোনদিন বাথ পার্টির সদস্য ছিলাম না বলে প্রাপ্য পদোন্নতি পাই নি।"

এদিনই গেলাম উত্তর তেহরানের লোকমান্দ দোলেহ্ হাসপাতালে। এখানে যুদ্ধাহত ইরানী সৈন্য ও আহত ইরাকী সৈন্যদের রাখা হয়েছে। একটি সম্পূর্ণ ওয়ার্ড জুড়ে জনা বিশেক যুদ্ধাহত সৈনিক। তাদের হাতও ভাঙেনি, মাথাও ফাটেনি। অঙ্গচ্যুতির কোন নিদর্শন নেই। গায়ে ফোস্কা পড়েছে কদাকারভাবে। ত্বক হয়ে উঠেছে লালচে। কুর্দিস্তানের স্কুল বালক ১৪ বছর বয়স্ক ফাল্লাহ্ একই ক্ষত নিয়ে এসেছে এই হাসপাতালে। হাসপাতালের জনৈক ইতালীয় সার্জন জানালেন এরা রাসায়নিক বিষযুদ্ধের শিকার। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী রণাঙ্গণে বিষযুদ্ধ বা রাসায়নিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইরাকী বাহিনী চোরাগোপ্তা পথে রাসায়নিক যুদ্ধযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে বলে তিনি জানালেন।

৭ই নভেম্বর গেলাম শাহেনশাহ রেজা শাহ পাহলভীর 'নিরাভরণ' রাজপ্রাসাদ দেখতে। প্রাসাদগুলি এখন জাতীয় যাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। সাজ-সজ্জা উপকরণাদি যেখানে যে অবস্থায় ছিলো সেভাবেই আছে। সেদিন বিকালে একটি গ্রামে বেড়াতে গেলাম। তেহরান কোম মহাসড়ক বরাবর যেতে আমাদের বলা হলো আমরা যে কোন গ্রামে যেতে পারি। আমাদের পছন্দ মাফিক এক জায়গায় এসে মাইক্রোবাস মহাসড়ক থেকে নামিয়ে দুই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে এক গ্রামে গেলাম। গ্রামের নাম ফালাশ্ত। হুজ্জাতুল ইসলাম সাঈদ আবু ফজলে হেসেন গ্রাম কমিটির চেয়ারম্যান। গ্রামটির কৃষি ও কারিগরী উপদেষ্টা হিসেবে শহর থেকে এসেছেন তরুণ প্রকৌশলী সারাহ বারোমী। সেচ প্রকল্পের কাজ চলছে একটি মজে যাওয়া খাল পুনঃখননের মাধ্যমে। গ্রামের মাটির ঘরগুলো মসজিদাকৃতির। একেবারে যেগুলো প্রাচীন, সেগুলো সংস্কার করে পাকা বিল্ডিং তৈরী হচ্ছে। বৃদ্ধ গ্রামবাসী আমির আব্বাস। বিপ্লবের পর সরকার যেভাবে গ্রামোন্নয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছেন, তাতে তিনি সন্তুষ্ট। আমির আব্বাসের ঘরে নিয়ে গেলেন আমাদের। আপ্যায়ন করলেন শসা আর শরবৎ দিয়ে। আসার সময় এক ঝুড়ি আপেল জোর করে তুলে দিলেন গাড়ীতে। তার নিজের হাতে লাগানো বাগানের ফল।

www.pathagar.com

৮ই নভেম্বর ইরান কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্ণর নূর বক্স-এর দেয়া দুপুরের খাওয়ার দাওয়াত এবং সাংবাদিক সম্মেলন। ৩৫ বছর বয়স্ক ব্যাংক গভর্ণর অর্থনীতিতে পি. এইচ. ডি. করেছেন মাত্র কয়েক বছর আগে। তিনি আই. এম. এফ-এর সূত্র উল্লেখ করে বললেন, যুদ্ধ শুরু হবার সময় ইরানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিলো ৩০ বিলিয়ন ইউ. এস. ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা ইরানী অর্থনীতির উপর যে ক্ষতিকর প্রভাব রাখে, তিনি সেকথা উল্লেখ করলেন। যুক্তরাষ্ট্রসহ পাশ্চাত্যের বেশ কয়েকটি দেশ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও ইরান অনেকের বকেয়া পাওনা ইতিমধ্যে শোধ করছে বলে তিনি প্রকাশ করেন। নূর বক্স-এর মতে আমদানী-রপ্তানীর যে স্থিতিশীল ভারসাম্য বিরাজ করছে, তাতে যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলেও ইরানের অর্থনীতি তাকে সামাল দিতে পারবে।

"তাহলে আপনারা এমনকি সাধারণ ভোগ্যপণ্যের উপরেও যুদ্ধ কর (War Tax) বসিয়েছেন কেন, প্রশ্ন করলেন তুরস্কের "কাম্বুরিয়েৎ" দৈনিকের সংবাদদাতা এরল ওজবেক। গভর্ণর জবাব দিলেন, জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই যুদ্ধের খরচ যোগাচ্ছেন। অপর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "আমাদের অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। আমরা অতীতের মডেল ঢেলে সাজাচ্ছি। উৎপাদনের লক্ষ্য মুনাফা নয়, জনকল্যাণ। সুদ মুক্ত ব্যাংকিং প্রথা চালু করেছি আমরা। বড় বড় শিল্প, খনি এবং সেবাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করে শহীদ পরিবার কল্যাণ, দুস্থ ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থার পরিচালনাধীনে দেয়া হয়েছে। শ্রমিক সমবায়, ব্যবস্থাপনা কর্মী এবং সরকার ত্রিপক্ষীয় মালিকানা ও অংশ গ্রহণের ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে শিল্পনীতি। কৃষি জমির মালিকানার উপর সিলিং করা হয়েছে এবং নামমাত্র মূল্যে ভূমিহীন কৃষিজীবীদের মধ্যে খাস জমি বিলি করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে কিছু আইনগত জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ নিয়ে মজলিসে (পার্লামেন্ট) বিতর্ক চলছে। আগামী পঞ্চসালা আর্থিক পরিকল্পনা নিয়েও মজলিসে বিতর্ক চলছে। যুদ্ধের প্রথম দু'বছর অর্থনীতির উপর বেশ চাপ এসেছিল। তবে বর্তমানে উৎপাদন প্রবৃদ্ধির হার বাড়ায় (১৪·৮%) অবস্থা সন্তোষজনক। যুদ্ধে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৫০ বিলিয়ন ডলার। 'সচিত্র স্বদেশ' এর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব নূর বক্স বলেন, আমরা তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নগামী মুসলিম দেশগুলোকে

www.pathagar.com

নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্যে কাজ করছি। ইনশাআল্লাহ্ 'কমনওয়েল্থ' ধরনের এই ঐক্য দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখবে।" বর্তমান মুদ্রাস্ফীতির হার ২০% বলে তিনি উল্লেখ করেন। বেসরকারী মতে এই হার যদিও তাঁর দেওয়া হিসাবের ঠিক দ্বিগুণ (৪০%)।

যুদ্ধের খেসারত

বিপ্লব ও যুদ্ধ—দুই দিক থেকেই ইরানী অর্থনৈতিক অবস্থা গত চার বছরে মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এতে গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত হয়েছে। গুজব রয়েছে যে, ইরান তার রিজার্ভ স্বর্ণ বিক্রি করছে। এমনকি ময়ূর সিংহাসনের ক্রাউন জুয়েল বিক্রি করে দিচ্ছে বলেও গুজব রয়েছে (পলিন জ্যাকসন দি এ্যারাবিয়া, মে, ১৯৮২)। তবে এই প্রতিবেদক বিদেশী ভোগ্যপণ্যের উপর ইরানবাসীদের নির্ভরশীলতা প্রায় শূন্যের কোঠায় নিয়ে আসাকে জাতীয় অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ইতিবাচক দিক হিসেবে উল্লেখ করেন। খনিজ সম্পদ ইরানের অর্থনীতির একটি বড় রকমের সহায়ক। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাস মওজুদের দেশ ইরান। সর্বোপরি ইরান একটি ওপেকভুক্ত দেশ। নগদ টাকার সমস্যাই এখন ইরানের বড় সমস্যা। কৃষিক্ষেত্রে ইরান অগ্রগতির সর্বকালের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কৃষি পণ্যের দাম বাড়ায় কৃষকরা তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিকের নিশ্চয়তা পাচ্ছে। গত কয়েক বছরের গমের উৎপাদন ২০% এবং চাল ৮% বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বাদ, গন্ধ এবং পুষ্টির বিচারে ইরানী চাল উৎকৃষ্ট শ্রেণীর। পাশ্চাত্যের শিল্পজাত পণ্যের উপর থেকে নির্ভরশীলতা কমিয়ে ইরান জাতীয় শিল্পের দিকে নজর দিয়েছে এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ ও পূর্ব ইউরোপীয় দেশসমূহের সাথে কাঁচামালের ব্যাপারে বার্টার প্রটোকল স্বাক্ষর করছে। দেশের অর্থ-নীতিকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখার প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে-ছেন ইরান সরকার। ব্যাপক হারে শিল্প-কল-কারখানা জাতীয়করণের ব্যাপারে সংশয় দেখা দিয়েছে। সরকার বেশ কিছু দক্ষ শিল্প উদ্যোক্তা এবং প্রযুক্তিবিদকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, বিপ্লবের পর যারা দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিলেন। খনি সম্পদ উত্তোলনের ক্ষেত্রে ইরানীদের সাথে সহযোগিতা করছে যুগোশ্লোভ ও পূর্ব জার্মান বিশেষজ্ঞরা।

www.pathagar.com

'স্বদেশ'-এর এক প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ইরানী শিল্প পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্ত (বুনিয়াদ-ই-মুজতাদ আফিন) দুঃস্থ কল্যাণ ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান বলেন, "জাতীয়করণের নামে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র যাতে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে না পারে, সে দিকে আমরা বিশেষ নজর রাখছি। শিল্পে ব্যক্তি উদ্যোগের বিরুদ্ধে নই আমরা। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শাহের আমলের মত সমগ্র জাতীয় সম্পদ গুটি কতেক পরিবারের হাতে তুলে দেয়া হবে। আশার কথা এই যে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প কল-কারখানা শ্রমিক সমবায়ের নিয়ন্ত্রণে থাকায় উৎপাদন প্রবৃদ্ধি আশাতীত-ভাবে বেড়েছে।"

আমাদের হোটেলের পাশে একটি চীনা রেস্তোরাঁয় মাঝে মাঝে রাতের খাবার খেতে যেতাম। হোটেলে যারা আসতেন তাদের বেশীর ভাগই জাপানী। ইরানের শিল্প ও প্রযুক্তি জগতে জাপানের অংশগ্রহণ রীতিমত অন্যদের কাছে ঈর্ষণীয়। পরে জানলাম সবাই জাপানী নন, এদের অনেকেই দক্ষিণ কোরিয়ার টেকনিশিয়ান। শিউলের সাথে তেহরানের কুটনৈতিক সম্পর্ক ইসলামী বিপ্লবের পর ছিন্ন হয়ে যায়। কিন্তু বন্দর খোমেনিতে গেলে দেখা যাবে পুরা বন্দরটাই চালাচ্ছে কোরীয় টেকনিশিয়ান ও কর্মকর্তারা। পাওয়ার স্টেশনগুলোর কাজ করছেন জার্মানরা। সম্প্রতি উত্তর তেহরানে একটি প্রাকৃতিক ইউরে-নিয়াম খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মওজুদের পরিমাণ পৃথিবীর মোট ইউরেনিয়াম মওজুদের প্রায় অর্ধেক (বেসরকারী মতে)।

"লা শারিকিয়া-লা গারবিয়া ইসলামিয়া-জামাহিরিয়া"

তেহরানের রাস্তায় মিছিলকারী স্কুল ছাত্র-ছাত্রী থেকে করে শুরু কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক পর্যন্ত সবাইকে বলতে শুনেছি ইরানের প্রকৃত জোট নিরপেক্ষতার কথা। গান গেয়ে তারা বলেন "লা শারিকিয়া—লা গারবিয়া, ইসলামিয়া জামাহিরিয়া...।" অর্থ ঃ না পূর্ব—না পশ্চিম, ইসলামী প্রজাতন্ত্রই শ্রেষ্ঠ। আমাদের সুদর্শনা গাইড তেহরান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রী মিস্ ফাখরী গানটি ইংরেজীতে অনুবাদ করলেন এভাবে ঃ **Neither East, Nor West, Islam is the Best...।**" বস্তুত গত চার বছরের ঘাত-প্রতিঘাতপূর্ণ পথ চলায় ইরানের ইসলামী বিপ্লব

www.pathagar.com

প্রমাণ করেছে যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন উভয় পরাশক্তির প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ক্ষমতা বলয়ের বাইরেও কোন দেশ আপন বলিষ্ঠতায় টিকে থাকতে পারে।

. উত্তর তেহরানে বাংলাদেশ দূতাবাসে যেতে একটা দৃশ্য চোখে পড়লো। সুপ্রশস্ত গান্ধী এ্যাভিনিউ। এক জায়গায় দেখলাম খুব জটলা। ভীড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই দেখলাম এক পাশে রাস্তার উপর আল্পনার মত করে আঁকা আমেরিকার পতাকা, অন্য পাশে রাশিয়ার। স্কুল ছাত্র-ছাত্রীরা মার্চ পাস্ট করে যাবার সময় আমেরিকার পতাকা মাড়িয়ে যাচ্ছে, আসার সময় পদদলিত করছে রাশিয়ার পতাকা। এই দৃশ্যটি বিধিবদ্ধ কুটনৈতিক রীতিনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। কিন্তু এর মধ্যে রয়েছে উভয় পরাশক্তির আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে ইরানের ঘৃণ্য সঞ্চিত প্রতিবাদের সোচ্চার প্রকাশ। ৯ই নভেম্বর আমরা যখন ইরানের প্রেসিডেন্ট আলী খামিনির সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম, তখন প্রেসিডেন্টের প্রাসাদের হল রুমে কম করেও জনা বিশেক মার্কিন পত্র-পত্রিকার স্থায়ী এবং সফররত সাংবাদিক দেখলাম। এদের মধ্যে নিউজ উইক, ওয়াল স্ট্রীট জার্ণাল ও ক্রিশ্চিয়ান সায়েন্স মনিটর এর মত নেতৃস্থানীয় পত্র-পত্রিকার প্রতিনিধিরাও ছিলেন। মার্কিন সরকারের প্রতি চরম ঘৃণা থাকলেও আমেরিকার মুক্ত মানুষ এবং গণমাধ্যম-গুলোকে ইরানে ভিন্ন চোখে দেখা হয় বলে মনে হলো।

বিপ্লবোত্তর রাজনীতি ও সমাজ

"ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে বুঝতে হলে তেহরানের নৃত্যশালা ও শুঁড়িখানাগুলোর বন্ধ দরজার দিকে অথবা যুদ্ধ বিধ্বস্ত আবাদানের দিকে তাকালেই চলবে না। এগুলো বিপ্লবের পরিণতি। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও কেতায় অভ্যস্ত ধনী সমাজ বিপ্লবকে বানচাল করার জন্যে এমন কোন পদক্ষেপ নেই যা গ্রহণ করে নি। ইরাক যে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে তাও বিপ্লবকে নস্যাৎ করার জন্যে। ইরানের আজকের পরিবর্তনের পটভূমি সুদূরে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত বিস্তৃত।" কথাগুলো বললেন আমাদের সহযাত্রী একজন লেবাননী সাংবাদিক। মধ্যপ্রাচ্য ও পারস্য উপ-সাগরীয় ঘটনা প্রবাহের উপর তিনি পাশ্চাত্যে উচ্চতর গবেষণা করছেন। কথা প্রসঙ্গে মনে পড়ে গেলো ফালাশ্‌ত্‌ গ্রামে যাবার সময় আমাদের

www.pathagar.com

সহযাত্রী ইসলামী গাইডেন্স মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা আলী আকবর বারাতির একটি কথা—"ফেরদৌসী, খৈয়াম, সা'দীর এই দেশে পাশ্চাত্যের নগ্ন নৃত্য ও মাদকতা আমদানী না করলে আমাদের যদি কেউ অশিক্ষিত ও আন্‌কালচারড্‌ বলে বলুক, তাতে আমাদের কিছুই যায় আসে না।-"

ইরান বিপ্লবের প্রধান দুটি দিক আছে। রাজনৈতিক এবং সামাজিক। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইরান এখনো একটি ক্রান্তিকাল অতিবাহিত করছে। দেশী-বিদেশী চাপের মুখে ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু এখন বিপদের মধ্যে রয়েছে। মাত্র মাস দুয়েক আগেও মধ্য তেহরানে বোমাবাজির ঘটনা ঘটেছে। সর্বত্র কড়া প্রহরা এবং দেহ তল্লাশী সম্ভবত সে কারণেই (কদাপি এগুলে বাইরের পর্যটকদের কাছে বিরক্তিকর লাগে বৈকি ?)

ইরানে রাজতন্ত্র থেকে উত্তরণ ঘটেছে সাধারণতন্ত্রে। শাহের-নির্যাতনের স্টীম-রোলারে পিষ্ট হয়েও যারা টু-শব্দটি পর্যন্ত করেন নি বা করতে পারেন নি তারা আজ রাতারাতি পাশ্চাত্য মডেলের গণতন্ত্র চাইছেন। বামপন্থীরা চাইছে সোভিয়েত প্রভাব। তুদেহ পার্টির প্রধান নুরুদ্দীন কিয়ানুরী থেকে শুরু করে গ্রেফতারকৃত সকল নেতৃস্থানীয় বামপন্থী নেতাদের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায় যে, তারা সকলেই সোভিয়েত গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি'র সাথে যুক্ত ছিলেন। (পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যমে কিয়ানুরীর মৃত্যুদন্ড কার্যকর হবার সংবাদ বের হয়, কিন্তু তিনি এখনো বহাল তবিয়তে বেঁচে আছেন)। তুদেহ নেতৃত্ব আয়াতুল্লাহ্‌ খোমেনির নেতৃত্বকে নিছক উন্মাদনা ভেবেছিলেন যেমন ভেবেছিলেন মধ্যপন্থী নেতৃত্ব।

কিন্তু ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, উমাইয়া শাসন থেকে শুরু করে বাগদাদ ও দামেস্কের পরবর্তী রাজতান্ত্রিক শাসন, সাফাভিদ রাজবংশ কাজারদের শাসন এবং পাহলভী রাজবংশের শাসনামলে যে কয়টি জনপ্রিয় আন্দোলন সূচিত হয়, তার পুরোভাগে ছিলেন ইরানের ধর্মীয় নেতৃত্ব। ১৯৫৩ সালের মার্কিন প্ররোচিত অভ্যুত্থানের পর মওলানাদের নেতৃত্বেই গড়ে উঠে "জাতীয় প্রতিরোধ আন্দোলন।" রাজবংশের শাসনের বিরুদ্ধে পারস্যের মহাকবি ফেরদৌসী নিজের জীবন দিয়ে সত্যনিষ্ঠায় অটলব্রত পালন করেন। সেই ধারার উত্তরসূরী

www.pathagar.com

ইরানের অত্যধিক রাজনীতি-সচেতন আলেম সমাজ। ১৯৬৩ সালে আলেম সমাজের নেতা হিসেবে আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর নাম ছড়িয়ে পড়ে। সেই আন্দোলনেরই পরিণতি ঘটে ১৯৭৯ সালে, সম্রাট রেজা শাহ পাহলভীর স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের সমূল উৎখাতে।

রেজা শাহের প্রতি অন্ধ সমর্থন এবং ইরানে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারের অভিযোগে সমগ্র ইরানী জনগণ সঙ্গত কারণেই আমেরিকার বিরুদ্ধাচারণ করে। ইসরাইল ও দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ও শাহের অভিন্ন নীতিও এর অন্যতম কারণ। বিপ্লবের পর যুক্তরাষ্ট্র ইরানের বিরুদ্ধে যেভাবে উঠে-পড়ে লাগে তাতে আর কোন সন্দেহই থাকে না যে যুক্তরাষ্ট্র ইরানের প্রথম দুশমন। বিপ্লবের পর ইরান বিশ্বজুড়ে মার্কিন বিরোধী প্রতিটি জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে সর্বাত্মক সহায়তা এবং একাত্মতা প্রকাশ করে। সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইরানী নেতৃবৃন্দের ক্ষোভের কারণ হলো আফগানিস্তানের সংকট এবং বিপ্লব বিরোধী তৎপরতায় ইরানী বামপন্থীদের সাথে রুশ যোগসাজশ।

ইরান বিপ্লবের উপর গবেষণারত ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য গবেষণা বিষয়ক অধ্যাপক ডঃ হামিদ আলগার যেমন বলেন "আমরা ভুলে যাই নি, ১৯৭৮ সালের নভেম্বরে রাশিয়া শাহকে সমর্থন দেয়। ওই সময়ে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকার ভাষা ও মন্তব্য অনুধাবন করলে দেখা যাবে সেগুলো ওয়াশিংটন পোস্ট, নিউইয়র্ক টাইমস্ প্রভৃতি মার্কিন পত্রিকার মন্তব্যেরই অনুরূপ। কিন্তু ডিসেম্বরে সোভিয়েত নীতির আশ্চর্য মোড় বদল লক্ষ্য করা যায়। তারা ইতিমধ্যেই ইসলামী বিপ্লবের প্রবাহ অনুধাবন করতে পারে এবং বলতে থাকে যে, আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীর ভূমিকা অন্তবর্তীকালীন মাত্র—চূড়ান্তভাবে সেখানে কম্যুনিস্ট বিপ্লবই সংঘটিত হবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মস্কোপন্থী ইরানী তুদেহ পার্টির নীতি পরিবর্তনের নির্দেশ দেয় এবং সে অনুসারে পার্টি সদস্যরা গণভোটে ইসলামী প্রজাতন্ত্রের পক্ষে মত দেয়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দী থেকে শুরু হওয়া ইরানের ইসলামী বিপ্লব যখন সম্পূর্ণতার মুখ দেখতে যাবে তখনই মরণ আঘাত হানে রাশিয়া ও মস্কোপন্থী ইরানী পার্টির সদস্যরা। প্রথমে প্রচার অভিযান, পরে সশস্ত্র অভিযান চালিয়েও তারা ইসলামী বিপ্লবকে

www.pathagar.com

নস্যাৎ করার পরিকল্পনা নেয়। কিন্তু কার্যত ইরানকে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পাশা খেলার ব্যর্থতা প্রমাণিত হয়েছে।"

গণভোটের মাধ্যমে ইরানে ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হয়েছেন মজলিস (পার্লামেন্ট) সদস্যরা। মজলিসের কাছে সরকার সর্বপ্রকার জবাবদিহিমূলক বাধ্য-বাধকায় আবদ্ধ। জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়েও অনেক সুন্নী মতাবলম্বী মজলিস সদস্য (ডেপুটি) রয়েছেন (৩৯ জন)। রয়েছেন আর্মেনিয়ান খৃস্টান এবং ইহুদী সদস্যও। নির্বাচিত হয়ে এসেছেন মহিলা সদস্যবৃন্দ। সমাজে মহিলাদের অধিকার সংক্রান্ত ব্যাপারে এঁরা সব সময় উচ্চকণ্ঠ। মদ, জুয়া ও ব্যভিচার নিষিদ্ধ এবং মৃত্যুদন্ডযোগ্য অপরাধ। গত সপ্তাহেও মাদকদ্রব্য পাচারের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ১৬ জনের ফাঁসি কার্যকর করা হয়েছে। তেহরানসহ প্রাদেশিক শহরগুলোর পূর্ণ-প্রেক্ষাগৃহে সুস্থ ইংরেজী ও ফরাসী চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হচ্ছে। পারস্য ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বহু আলোচিত অধ্যায় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দোদুল্যমান বুদ্ধিজীবীরা

ইরান বিপ্লবের আগে, বিপ্লব চলাকালে এবং বিপ্লবের পরে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা একটি উচ্চমধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর সুনির্দিষ্ট ভূমিকা ছিলো এবং রয়েছে। তুদেহ বা মুজাহিদীন খালক পার্টির ন্যায় সংঘবদ্ধ না হলেও এই বুদ্ধিজীবীরা অসংগঠিতভাবেই একটি বড় শক্তি। এরা শাহের একচ্ছত্র রাজকীয় শাসন কোনদিনই মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। আবার রাজদ্রোহী কেন্দ্রীয় প্রবাহ দেশের আলেম সমাজের মধ্যে থাকায় এরা সেদিকেও ঝুঁকতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। ১৯৭৯ সালে বিপ্লব যখন তুঙ্গে, তখনও এরা তেবেছিলেন শাহকে উৎখাত করার পর একটি পাশ্চাত্য মডেলের সমাজই বহাল থাকবে, গণতন্ত্র রাজতন্ত্রের স্থলাভিষিক্ত হবে এই যা। কিন্তু তারা যখন কার্যত দেখলেন যে, একটি সুসংগঠিত ইসলামী শক্তি ক্ষমতা দখল করেই ক্ষান্ত হয়নি, একটি সামগ্রিক পরিবর্তন সাধনে তারা দৃঢ় সংকল্প, তখনই বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দিলো। এমন কিছু লোক যারা আজীবন রাজতন্ত্রের

www.pathagar.com

বিরোধিতা করে এসেছেন, তারাই চলে গেলেন গণধিক্কৃত শাহের ক্ষয়িষ্ণু ব্যবস্থা জোড়া-তালি দিয়ে চালু রাখার প্রয়াসের পক্ষে। শাপুর বখতিয়ার থেকে শুরু করে মেহেদী বাজারগান পর্যন্ত মধ্যপন্থী নেতৃবৃন্দের আশ্রয়ে তারা পরিপুষ্ট হয়েছেন এবং আলেমদের হাত থেকে যত শীঘ্র নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, সে চেষ্টা করেছেন। একটি সমাজ বিপ্লবের জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মুখে বসে ইরানী বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর এক অংশের এরকম ভাব-বিলাসী বাসনা উপযোগী প্রমাণিত হয় নি। আজ এই অংশটি রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনার মূল প্রবাহ থেকে ছিটকে পড়ে হয় অনিকেত প্রবাস জীবন বেছে নিয়েছেন, নয়তো দেশের ভেতরে নীরবতা পালন করে চলেছেন। অথচ এঁদের মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি সমাজ বিপ্লবের এই সংকটকালে জাতীয় পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পরতো। যে অংশটি তুদেহ বা মুজাহিদীন-ই-খাল্ক পার্টির সাথে জড়িত ছিলো, তারা নিশ্চিত বিপর্যয় বরণ করেছেন। বাকী অংশটি যোগ দিয়েছেন আলেম সমাজের সাথে। লক্ষ্যণীয় ব্যাপারটি হলো এই যে, এই শেষোক্ত অংশটি তুলনামূলকভাবে বয়সে নবীন। প্রতিটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎকার পূর্বে দেখেছি এরাই সব কিছু আয়োজন করেছেন, ফার্সীতে দেয়া নেতাদের বক্তৃতা-বিবৃতি ইংরেজী, ফরাসী ও প্যানিশ ভাষায় তৎক্ষণাৎ অনুবাদ করে দিচ্ছেন, তথ্য দিয়ে সাহায্য করেছেন, বড় বড় আধুনিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় আত্মনিয়োগ করেছেন, শাহ আমলের কূটনৈতিক মিশনের সার্ভিসে স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। 'ইরান এয়ার'এ এবং মেহরাবাদ বিমান বন্দরে কর্মকর্তা ও কর্মীদের মধ্যে বেশীর ভাগই দেখলাম তরুণ। অনেকে ঠিকমত কাজ করতে পারছেন না। কিন্তু সদিচ্ছা ও আগ্রহের কমতি নেই। বিমানের মধ্যে স্টুয়ার্ড ও বিমানবালারা দেখলাম খোশ গপ্পে মত্ত। যাত্রীদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর নেবার ব্যাপারে খুব একটা গা লাগাচ্ছে না তারা। পাশের সীটে বসেছিলেন একজন ইরানী ছাত্র। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন। দেশে ফিরছিলেন। বললেন, "বিমানের কর্মচারীরা এমনিতেই একটু কেতাদুরস্ত। শাহের আমলে এরা ছিলো স্বর্গসুখে। ফ্লাইটের কাজ শেষ হলেই একেকজন চলে যেতো পারিস, লন্ডন, বোম্বে। দেখে মনে হতো এরা ইরানী নয়, ইউরোপীয়। মদ না হলে চলতো না, সঙ্গী ছাড়া সময় কাটতো না। ইসলামী অনুশাসন তাই এরা মন থেকে নিতে পারছে না।"

www.pathagar.com

বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবী স্রোতের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পারার আরও অনেকগুলো কারণ আছে। এরা একটি সিস্টেম এর ফসল। সেটা হলো রেজা শাহের ব্যাপক আধুনিকায়ন ও শিল্পায়ন কর্মসূচী। সরকারী খরচে এরা পাশ্চাত্যে লেখাপড়া শিখেছেন। দেশে ফিরে চাকুরী পেয়েছেন। সেবা করেছেন শাহ্তন্ত্রের। সেই তন্ত্র আর যাই হোক গণতন্ত্র ছিলো না। শাহীতন্ত্রের সেবা করাই ছিলো দেশপ্রেম। শাহের বিরোধিতা করা মানেই ছিলো দেশদ্রোহিতা। কঠোর নিপীড়াশ্রয়ী শাসনের বাইরে বিশাল এক গ্রামীন ইরান। আধুনিকায়ন সীমাবদ্ধ ছিলো মূলত তেহরানে, বড়জোড় প্রাদেশিক শহরগুলোয়। গ্রাম ছিলো উপেক্ষিত, অনাদৃত। উপেক্ষিত ছিলো গ্রামের মানুষ, গ্রাম ভিত্তিক আলেম সমাজ। বিপ্লবের পর ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু 'নিরাভরণ' প্রাসাদ থেকে সরে গিয়ে শত সহস্র ভাগে বিভাজিত হয়ে বিস্তৃত হলো গ্রাম-গ্রামান্তরের মক্তব, মাদ্রাসা ও মসজিদে। শাহীতন্ত্রের বিরুদ্ধে তারাই রক্ত দিয়েছেন, যুগের পর যুগ অবর্ণনীয় উৎপীড়ন সয়েছেন।

শহুরে বুদ্ধিজীবীরা আলেম সমাজের নেতৃত্ব মানতে নারাজ। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি তাদের কাছে জ্ঞানের সর্বোচ্চ মাপকাঠি। পেশাগত জীবনেই শুধু নয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাদের এ রকম ধারণা। কিন্তু দীর্ঘদিন যারা গ্রামের সাথে কোন সম্পর্ক রাখার প্রয়োজন মনে করেন নি, উপেক্ষা করেছেন গ্রামীন সব কিছুকেই, তারা গ্রাম থেকে শহরমুখী রাজনৈতিক নেতৃত্ব কাঠামোয় সঙ্গত কারণেই ঠাঁই পান নি। ইরানের বুদ্ধিজীবীদের অবস্থা আজ এ রকম যে তারা না ঘাটের, না ঘরের। ইরানী বিপ্লব যে বুদ্ধিবৃত্তিগত সংকটে ভুগছে, তার কারণ এটাই। অন্তত দু'সপ্তাহ ইরান ঘুরে এসে এটাই আমার মনে হয়েছে। তবে অনেকেই ডঃ মেহেদী-বাজারগণ, ডঃ ইয়াদুল্লাহ্ শাহাবী ও আয়াতুল্লাহ তেলেঘানীর নাম স্মরণ করতে শুনেছি। এরা আন্তরিকভাবে শহরাশ্রয়ী বুদ্ধিজীবী ও গ্রামীণ উলেমা সমাজের মধ্যে একটা সংযোগ ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিছুটা সাফল্যও লাভ করেছিলেন। কিন্তু বিপ্লবের অনিবার্যতা সেই মন্থরগতির সাফল্যের পানে চেয়ে দীর্ঘকাল উপেক্ষা করতে পারে নি। শাহের আধুনিকীকরণের সাথে সাথে নাস্তিক্যবাদ, ইসলামী মূল্যবোধ বিনাশী আয়োজন ও সংস্কৃতির নামে বেলেল্লাপনা যেভাবে

www.pathagar.com

সহ্যের সীমা ছড়িয়ে গিয়েছিলো, তাতে শাহতন্ত্র ও পাশ্চাত্যমুখী তেহরান সভ্যতার-বিনাশ নিতান্তই অনিবার্য হয়ে পড়েছিলো।

উপর্যুপরি প্রতিবিপ্লবের প্রয়াস

"ইরাকের বাথিস্ট জান্তা আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে বিপ্লব বিনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, তাই—শুধু নয়। এ যুদ্ধ শুরু হবার আগে থেকেই বিপ্লব বিরোধী দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্ত চলেছে এবং অভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লব বাইরের চক্রান্তের চেয়ে কোন অংশে কম নয়।" সচিত্র স্বদেশকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে কথাগুলি বললেন মজলিসের ডেপুটি স্পীকার। তেহরানসহ বেশ কয়েকটি শহরাঞ্চলে আমরা দেখেছি নিরাপত্তামূলক কড়াকড়ি মাঝে মাঝে বিরক্তিকর পর্যায়ে পৌঁছায়। প্রশ্ন করেছিলাম এত কড়াকড়ির উদ্দেশ্য কি? অনেকেই এর জবাবে অব্যাহত বিপ্লব-বিরোধী তৎপরতা এমন কি সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের কথাও উল্লেখ করলেন। '৮৩ সালের শুরু থেকে তেহরান ইসলামী গার্ডবাহিনীর পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু এর পূর্ব পর্যন্ত বোমাবাজি ও চোরা গোপ্তা হামলা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। আশ্চর্য হই নি যখন শুনলাম প্রতিবিপ্লবের আখড়া উত্তর তেহরানে। উইলি ব্রান্টের উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধের মত তেহরানের উত্তর-দক্ষিণেও যথাক্রমে ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্যের বিপ্রতীপ অবস্থান। উত্তরে বাস করেন ধনীরা; দক্ষিণ তেহরানে মজদুর ও মুজতাদ আফিন (দুঃস্থ) ইরানীদের বাস।

তেহরানে একটি হোটেলে থাকেন বাংলাদেশী ডাক্তাররা। জনৈক সহযাত্রী সাংবাদিক তার এক ডাক্তার বন্ধুর সাথে গিয়েছিলেন উত্তর তেহরানের এক বাড়ীতে। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন তা' নিম্নরূপ। বাড়ীর পুরুষ ও মহিলা সদস্যদের সবাই পদস্থ কর্মকর্তা। গৃহকর্ত্রী সন্ধ্যার বেশ পরে বাসায় ফিরলেন। সদর দরজা দিয়ে ঢুকেই তিনি তার পরিধেয় বস্ত্রাদি (বোরখাসহ) ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শুধু অঙ্গবাসটুকু পরে শয্যাকক্ষের দিকে যেতে যেতে ইসলামী বিপ্লবের মুন্ডপাত করলেন বেশ কয়েকবার। ধারণা করতে কষ্ট হয় না যে, বিপ্লবোত্তরকালে পর্দা-পুশিদার ব্যাপারে ইসলামী মৌলাবাদের যে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে, উত্তর তেহরানের বিত্তশালীদের

www.pathagar.com

কেউ কেউ তাকে মেনে নিতে পারছেন না। কিন্তু দক্ষিণ ও মধ্য তেহরানে দেখেছি মহিলারা কেউ বোখরা পরে, কেউ কোট ও পায়মোজা (স্কার্ফ) জড়িয়ে দিব্যি নাগরিক জীবন চালিয়ে যাচ্ছেন।

বিপ্লব বিরোধী সামাজিক শক্তির সাথে তাল মিলিয়ে চলছে রাজনৈতিক শক্তি। তুদেহ মুজাহিদীন-ই-খালক সংগঠনের সাথে সরাসরি জড়িত নয়, এমন সব ব্যক্তি বা গোষ্ঠিও ইসলামী মৌলবাদের নব জাগরণকে বাধা দিয়ে আসছে। অথচ যে হারে প্রতিবন্ধকতা আসছে সে অনুসারে দমন নীতি অনুসৃত হওয়ায় অনেক ক্ষেত্রে সরকার ও ইসলামী বিপ্লবের রক্ষীদের কম নাজেহাল হতে হচ্ছে না। কোম বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন বয়োঃপ্রবীণ ধর্মীয় শিক্ষক আমাদের বললেন "ইসলামী বিপ্লবের তাৎপর্য ও সামর্থ অনুধাবন করতে না পারাই বিপ্লব-বিরোধীতার অন্যতম প্রধান কারণ। বৃহৎ শক্তিগুলোর (তিনি যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের কথা বললেন) ক্ষেত্রেও এই একই কথাই প্রযোজ্য।"

বিপ্লবোত্তর অস্থিরতা এবং বাড়াবাড়ি সম্বন্ধে কর্তৃপক্ষ উদাসীন একথা বোধহয় ঠিক নয়। যেমন আমরা টেলিভিশনে একটি কার্টুন অভিনয় দেখলাম। একজন ক্ষুধার্থ লোক নামাযের কাতারে দাঁড়িয়ে গোলমাল বাধিয়ে দিয়েছে। নামাযীদের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখে মসজিদের একজন লোক এসে তাকে জিজ্ঞাসা করলো নামাযে দাঁড়িয়ে সে এমনটি করছে কেন। ক্ষুধার্থ লোকটি বললো, "আজ দুদিন রুটির লাইনে দাঁড়িয়ে ব্যর্থ হয়েছি। এখন ইমাম সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে এভাবে গন্ডগোল করছি। দেখি তার কাছ থেকে রুটির পারমিট নেয়া যায় কি না।" এই কার্টুনটিতে দু'টি বিষয় স্পষ্ট ফুটে ওঠে। প্রথম—বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিক্ষত একটি অর্থনৈতিক সংকট, দ্বিতীয়ত এ সংকটের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের সচেতনতা। তা নাহলে আত্ম-সমালোচনামুখর এমন চিত্র জাতীয় টেলিভিশনে দেখানো হতো না।

বিপ্লব বিরোধী সামাজিক শক্তির সাথে আরও যুক্ত হয়েছে উপজাতীয় এবং আঞ্চলিক সমস্যা। এদের মধ্যে প্রধান হলো কুর্দিস্তান সমস্যা। কুর্দি ছাড়াও রয়েছে খুজিস্তানের আরব জাতীয়-বাদী সম্প্রদায়, উত্তর-পূর্ব ইরানের তুর্কমান উপজাতি এবং দক্ষিণ

www.pathagar.com

পূর্বাঞ্চলীয় বালুচ এবং তুর্কি ভাষাভাষী আজার-বাইজানীয় সম্প্রদায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন, পাকিস্তান, ইরাক প্রভৃতি প্রতিবেশী শক্তির বিভিন্ন স্বার্থে কাজ করছে এসব উপজাতীয় এবং আঞ্চলিক ইস্যুতে। কুর্দিদের কথাই ধরা যাক। অতীতে শাহের আমলে কুর্দিরা নিপীড়িত এবং নিগৃহীত হয়েছে। বিপ্লবের প্রথম দু'বছর ধরেও অব্যাহত থাকে কুর্দিদের বিচ্ছিন্নতাবাদী গেরিলা তৎপরতা। কিন্তু তেহরানে ইসলামী সংবিধান প্রণয়নের পর বিচ্ছিন্নতাবাদী তৎপরতা লক্ষ্যণীয়ভাবে শীতল হয়ে আসে। ইসলামের পাশাপাশি খৃস্টান, ইহুদী এবং জরোস্ট্রিয়ান, ধর্মাবলম্বীদের সমানাধিকারের বিধান স্বীকৃত হয়েছে নতুন সংবিধানে। খুজিস্তানের আরবরা বরাবরই ছিলো পারস্য ইরানের সংখ্যালঘু উপজাতি। ইরাকী আক্রমণের পর, এমনকি কিছু অংশ ইরাকের দখলে চলে যাবার পর খুজিস্তানী আরবরা ইরাকের পক্ষ অবলম্বন করবে এটাই ছিলো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এ ধরনের হিসাব যারা করে-ছিলেন বাস্তবতা তাদেরকে দারুনভাবে হতাশ করেছে। বহু বিভক্ত ইরানী উপজাতীয়রা বরং দৃশ্যত আগের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী আনুগত্য প্রকাশ করেছে তেহরানের প্রতি।

উপসাগরীয় যুদ্ধ

ইরান-ইরাক যুদ্ধ ইরানের ইসলামী বিপ্লবোত্তর একটি প্রধান ও এমন একটি ইস্যু, যার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে গেছে ইরানের বিপ্লব। ইরানের বক্তব্য হলো রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে গণ-বিপ্লবের যে জোয়ার উঠেছে ইরানে, তার বিস্তার রোধের জন্যেই বৃহৎ শক্তি ও আঞ্চলিক রাজতন্ত্রের যোগসাজশে ইরানের উপর এ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অপরদিকে ইরাকের বক্তব্য হলোঃ এ যুদ্ধের যে ইস্যু অর্থাৎ শাতিল আরব জলপথের মালিকানা, তা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অমীমাংসিত রয়ে গেছে। শাহের আমলে ক্ষমতাশালী পারস্য শক্তি অনেকটা বলপূর্বক এই প্রণালী তাদের করায়ত্তে রাখে। কিন্তু শাতিল আরবের অর্ধেক জলসীমায় তাদের অধিকার রয়েছে। ইরান তা অস্বীকার করে। ইরানের বক্তব্য হলোঃ শাতিল আরব জলপথে ইরানেরর অধিকার ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। প্রথম মহাযুদ্ধে অটো-ম্যান সাম্রাজ্যের পতনের পূর্ব পর্যন্ত শাতিল আরব বিতর্ক নিরসনে চারটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। প্রথমটি ১৬৩৯ ও এরপর যথাক্রমে ১৮২৩,

www.pathagar.com

১৮৪৭ এবং ১৯১৩ খৃস্টাব্দে। এসব চুক্তিতে শাতিল আরব জলপথের উপর তৎকালীন অটোম্যান এবং পারস্য সাম্রাজ্যের যৌথ মালিকানা স্বীকৃত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত এসব চুক্তিতে বর্ণিত স্থিতাবস্থা (Status Quo) বজায় থাকে। এরপর বৃটিশ অবরুদ্ধ ইরাকের স্বার্থের অনুকূলের ১৯৩৭ সালে সম্পাদিত হয় নতুন চুক্তি। এ চুক্তিতেও শাতিল আরব জলপথ নিয়ন্ত্রণ ও জাহাজ চলাচলের যৌথ কর্তৃত্বের কথা স্বীকৃত হয়। পরবর্তীকালে চুক্তি ঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা' পর্যবেক্ষণের জন্যে উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক পর্যায়ে বিশেষজ্ঞ মহলের যৌথ আলোচনার বিধান থাকলেও ইরাক আলোচনার টেবিলে না বসে শাতিল আরব জলপথের একক মালিকানার দাবী অব্যাহত রাখে। আবাদান ও খুররম শহরের সীমানাই ইরানের সীমানা, ইরান তা' মানতে নারাজ।

ইরানের বক্তব্য হলো, স্থল সীমানা আইন নয় বরং নদী সীমানাই (River bed line) এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া উচিত। শাতিল আরবের উপর একক কর্তৃত্বের দাবীতে অটল থাকার এক পর্যায়ে ইরাকের সাথে সম্পাদিত ১৯৩৭ সালের চুক্তি একতরফাভাবে প্রত্যাহার করেন ইরানের শাহ এবং ১৯৭৪ সালে ইরাকের সীমান্ত অঞ্চলে ইরানী বাহিনী আক্রমণ শুরু করে। ১৯৭৫ সালে আলজিরিয়ার মরহুম প্রেসিডেন্ট হুয়ারী বুমেদিন এ ব্যাপারে একটি আপোষ মীমাংসার মধ্যস্থতা করেন এবং দুই পক্ষকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে আসেন। ১৯৭৬ সালে সম্পাদিত হয় আলজিয়ার্স চুক্তি। এ চুক্তিতেও অতীতের সকল চুক্তির ন্যায় শাতিল আরবের উপর যৌথ সার্বভৌমত্বের বিধান স্বীকৃত হয়। কিন্তু ১৯৮০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর সে চুক্তি লংঘিত হয় ইরাকী আক্রমণের মাধ্যমে। ইরাকের কাছে ইস্যু শাতিল আরব হলেও এ আক্রমণকে ইরান তার ইসলামী বিপ্লবের উপর আক্রমণ বলেই মনে করে।

সেই থেকে চলছে মুসলিম উম্মাহ্‌র এই দুই শক্তির মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। সমগ্র বিশ্বের মুসলমান মাত্রেই ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের অবসান চায়। দজলা-ফোরাত বেয়ে যে শোণিত ধারা আজ বয়ে যাচ্ছে, তা, ইরানীরা হোক আর ইরাকীরা হোক, মুসলমানেরই তাজা খুন। এই যুদ্ধে ইরান তার বিপ্লবকে করে তুলছে বিপন্ন; ইরাক

www.pathagar.com

হারাচ্ছে তার ভাবমূর্তি। এখানে যে মারছে সে মুসলমান, যে মরছে সেও মুসলমান। রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত আজ একই প্রার্থনা—বন্ধ হোক এ ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ, বন্ধ হোক রক্তপাত।*

---

* এ যুদ্ধটাকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বলাটা প্রতিক্রিয়াশীল আরব রাষ্ট্রসমূহ এবং সাম্রাজ্যবাদী প্রচারমাধ্যমগুলোর যৌথ কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়। রাবাত থেকে জাকার্তা পর্যন্ত মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর দন্ডমুন্ডের কর্তা হ'য়ে যারা বসে আছেন তাদের বেশীরভাগই জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা নিয়ে ক্ষমতায় আসীন।

ইমাম খোমেনী ও ইরানের সরকার বারবার করে বলেছেন যে, আমাদের যুদ্ধটা ইরাকী জনগণের বিরুদ্ধে নয়, মুনাফিক সাদ্দামচক্রের বিরুদ্ধে। সাদ্দামের সাথে এ যুদ্ধ করার মধ্য দিয়ে আসলে আমরা সংগ্রাম ক'রে চলছি বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, সাদ্দাম যাদের হাতের ক্রীড়ানক। ইরাকী জনগণেক আপন ভাই মনে করার কারণে বারংবার ইরানী জনপদে ইরাকের বর্বরোচিত মিসাইল হামলা সত্বেও ইমাম খোমেনীর কড়া নির্দেশে ইরানী যোদ্ধাদের পক্ষ থেকে ইরাকী জনপদগুলোর প্রতি একটি ঢিলও নিক্ষিপ্ত হয়নি। এছাড়া, ইরাকী জনগণ, এমনকি সেনাবাহিনীও যে সাদ্দামী কুশাসনের চেয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ও এ বিপ্লবকে বেশী ভালোবাসেন তার প্রমাণ তো লেখক যে সমস্ত ইরাকী সৈনিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন তারাই।

www.pathagar.com

ইসলামী বিপ্লবের পরে ইরানী মেয়েরা

শেখ মুহম্মদ নুরুল ইসলাম

দুটি ছবি দেখলাম ইরানের সাবেক শাহের তেহরানস্থ গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে। একটি রাণী ফারাহ দিবার। অপরটি শাহের বোন প্রিন্সেস আশরাফীর। প্রথম ছবিতে পাশ্চাত্যের পোশাক পরিহিতা ফারাহ দীবা এবং আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট কার্টার পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। দ্বিতীয় ছবিটিতে প্রিন্সেস আশরাফী বসে আছেন একটি চেয়ারে। স্বচ্ছ আবরণের মধ্য দিয়ে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যংগ দেখা যাচ্ছে। ক্যামেরার চোখে ধরে রাখা এ দুটো ছবির মতোই শাহের আমলে বহু ইরানী মেয়ে পাশ্চাত্যের ভাবধারায় প্রভাবান্বিত হয়ে উগ্র আধুনিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলো। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা ইউরোপকেও ছাড়িয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু মাত্র তিন বছর পূর্বে, অনুষ্ঠিত ইসলামী বিপ্লব তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। এখন তাদের দেখলে একথা কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, কিছুকাল আগেও চলনে-বলনে পোশাক-পরিচ্ছদে তারা ইউরোপীয়ানদের অনুসরণ করতো।

নজরুলের গানের কলি অনুযায়ী ইরানী মেয়েরা এখন আর নাচে না। তবে তারা জোরে হাঁটে, প্রয়োজনে দৌড়ায়ও। ইসলামী বিপ্লব তাদের পর্দাবৃত করেছে কিন্তু ঘরে আটকে রাখে নি। তারা হাটু, কাধ ও কবজি পর্যন্ত জামা পরে। হাটু পর্যন্ত পরে মোজা, পায়ে থাকে হাইহিল স্যান্ডেল-সু। ঠিক বোরখা নয় একটা আলগা কাপড় দিয়ে শরীর ও মাথা ঢেকে রাস্তায় বের হয়, যত্রতত্র চলাফেরা করে। শাহের আমলের মতোই তারা নিয়োজিত আছে সব কাজে। অফিসে, আদালতে, দোকানে, হোটেলে, হাসপাতালে, হাওয়াই জাহাজে—সব জায়গাতেই তারা চাকরি করছে। বাজারে এবং রাস্তায় মেয়েদের সংখ্যাই বেশী। এমন পরিবার খুব কমই আছে যেখানে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে চাকরি করে না। আমাদের একজন গাইডও ছিলো মেয়ে। জিজ্ঞাসা করে জানতে পেরেছি, এই পর্দাটুকু পালন করার জন্যে

www.pathagar.com

কর্মক্ষেত্রে তাদের কোনোই অসুবিধা হয় না। এয়ার লাইনের বিমান-বালাও পর্দাসহ কর্তব্য কর্ম সম্পাদন করছে স্বচ্ছন্দে। সাধারণত ইরানী মেয়েরা কোন অলংকার পারে না। স্বাভাবিকভাবেই এজন্যে তাদের স্বামীদের আমাদের মত বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় না। কোম শহরের মসজিদে, শাহের প্রাসাদে, যাদুঘরে, যুদ্ধাহতদের হাসপাতালে, শহীদদের মাজারে, বেহেশতী জাহরাতে—সব জায়গাতেই দেখেছি মেয়ে দর্শকদের ভীড় বেশী। দেশের দূরদূরান্ত থেকে এসে তারা এসব পরিদর্শন করে। হাসপাতালের আহত যোদ্ধাদের দেখতে যাওয়ার সময় তারা কেউ কেউ মিষ্টি ও ফুল নিয়ে যায়। সাথে থাকে ইমাম খোমেনীর ছবি। আমরা যেখানেই গিয়েছি দেখেছি মেয়েরা আমাদের দেখে শ্লোগান দিয়েছে, উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে শুনিয়েছে। তাদের শ্লোগান ছিল ইসরায়েল ও দুটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে। একটা জিনিস দেখে অবশ্য আমরা অবাক হয়েছি যে, ইরানের পাঁচ ছয় বছর বয়সের বালিকাদেরকেও পর্দায় আবৃত করা হয়েছে। সম্ভাবত ইসলামী জীবন-যাপনে অভ্যস্ত করে তোলার জন্যেই এখন থেকে এই পর্দার তালিম দেয়া হচ্ছে। রেডিও, টেলিভিশনে মেয়েরা অনুষ্ঠান করে। সেখানেও রয়েছে পর্দার কড়াকড়ি। কোনো বিদেশী মহিলাকে পর্দা ছাড়া ইরানে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। আমাদের সঙ্গে স্পেন ও বেলজিয়ামের দুজন মহিলা সাংবাদিক ছিলেন। তাদেরও বাইরে বেরোনোর সময় ইরানী মেয়েদের মতো পর্দা করতে হয়েছে।

একটি অফিসের ওয়েটিং রুমে এক ইরানী তরুনীর সাথে আমার দীর্ঘক্ষণ আলাপ হয়। অন্যত্র বেশ কিছু চেয়ার খালি থাকলেও নিঃসংকোচে সে এসে আমার পাশের চেয়ারটিতে বসলো। নাম তার মরিয়ম। সে একজন কলেজ ছাত্রী। আমাকে বিদেশী মনে করেই সে ভাংগা ভাংগা ইংরেজীতে আমার সাথে আলাপ জুড়ে দিলো। প্রথমেই সে ভালো ইংরেজী জানে না বলে বিনয় প্রকাশ করলো। ইংরেজী আমার মাতৃভাষা নয় এবং ভাষাটা আমিও তেমন রপ্ত করতে পারি নি বলে তাকে আশ্বস্ত করলাম। মরিয়ম বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে চাইলো। আমি একে একে তার সব প্রশ্নের জবাব দিলাম। আমি তাকে বললাম আমাদের বাংলাদেশে তোমার মতো হাজার হাজার মেয়ের নাম মরিয়ম রাখা হয়। আরো জানলাম যে, আমাদের মাতৃভাষায় আট হাজারেরও অধিক তোমাদের ফার্সী

www.pathagar.com

শব্দের প্রচলন রয়েছে। একথা শুনে মরিয়ম খুব খুশী। তার কাছ থেকে বিদায় নেয়ার সময় সে খোদা হাফেজ বলে সম্ভাষণ জানালো। ঐ একটি মাত্র তরুনীর সাথে আলাপ করেই বোঝা গেলো ইরানের জনসাধারণ আমাদের দেশ সম্পর্কে কতটা আগ্রহী।

বাংলাদেশের অতি আধুনিকরা পর্দার তোয়াক্কা করে না। তারা মনে করে, পর্দা করলেই নারী স্বাধীনতা লুপ্ত হবে। ইরানের মেয়েরা পর্দা করে আমাদের মেয়েদের চেয়ে বেশী স্বাধীনতা ভোগ করছে। সব চাকরিতেই তাদের প্রবেশাধিকার রয়েছে। রাস্তায় তারা অবাধে চলা-ফেরা করে। উপরন্তু পর্দা তাদের মহামান্বিত করেছে। নারী নির্যাতন, নারী ধর্ষণ, নারী হত্যা, যৌতুকের জন্যে নারীর আত্মহত্যা ইত্যাদি ঘটনা সেখানে নেই। বখাটে ছেলেরা স্কুল-কলেজের ছাত্রীদের উত্যক্ত করার দুঃসাহস দেখাতে পারে না। সেখানে গভীর রাতেও তারা স্বচ্ছন্দে পথ চলতে পারে একাকী। সুতরাং নারীর জীবনের পূর্ণাঙ্গ নিরাপত্তা রয়েছে সেখানে, রক্ষা পাচ্ছে নারীর মান-সম্মান ইজ্জত-আব্রু। উপরন্তু একমাত্র পর্দার কারণে আমরা বিদেশীরাও ইরানের মহিলাদের অত্যন্ত সম্ভ্রমের চোখে দেখেছি। ইসলামী পর্দা সত্যিই ইরানী মেয়েদের মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। নারীকূল শিরোমনি খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমার (রাঃ) জন্ম দিনটিকে ইরানী মেয়েরা প্রতি বছর 'নারী দিবস' হিসাবে পালন করে থাকে।

ইরানের মেয়েরা পবিত্র কুরআনের বিধি-বিধান অনুযায়ী পুরো-পুরি ইসলামী জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে ঠিক এই মুহূর্তে এমন দাবী করা যাবে না সত্য, তবে এ পথে তারা ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। হয়তো একদিন তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতে সমর্থ হবে। মোটকথা মোটামুটি ইসলাম ও আধুনিকতার নির্বিরোধ সহাবস্থান দেখতে হলে ইরানে যেতে হবে। ইসলামী বিপ্লবী সরকার যুগের দাবি থেকে ইরানী ললনাদের বিন্দুমাত্র বঞ্চিত করে নি—শুধু উগ্র আধুনিকতা ও উচ্ছৃংখলতা থেকে মুক্ত করে পরিমার্জিত ও রুচিশীল করেছে—তাদেরে শালীনতাবোধ জাগ্রত করেছে। পর্দাই নারীর ভূষণ, এ সত্য তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশের আধুনিকরাও যদি ইরানী মেয়েদের অনুসরণে স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে যাতায়াত করে তা হলে আমার মনে হয় এখানেও নারীঘটিত অনেক কেলেংকারী ও অপ্রীতিকর দুর্ঘটনার হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

www.pathagar.com

তেহরান ডায়েরী

মীর নুরুল ইসলাম

শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলভী নেই। তার সেই রাজকীয় ঠাট আর জৌলুসও এখন নির্বাসিত। একদা যে তেহরান নগরী ছিল রূপ-কথার পরীদের মেলা। তাও ভেঙ্গে গেছে রাখালের সংগ্রামী বাঁশীর সুরে। নারীদেহ এখন বিপণনের সামগ্রী নয়। তেহরানের মাটিতে পা দিয়ে প্রথমেই একথাটা মনে হয়েছিল।

আমন্ত্রণ এসেছিল আকস্মিকভাবে। ইরানে ইসলামী বিপ্লবের কার্যকারিতা এবং সেই মহান বিপ্লবের মহোত্তম মহানায়ক আয়াতুল্লাহ্ খোমেনীকে দেখার আগ্রহ ছিল স্বাভাবিকভাবেই। একান্তরে বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের বৈপ্লবিক সংগ্রামের বিজয় এবং ধর্মভিত্তিক ইসলামী বিপ্লবকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে তুল্য বিচারের একটা মানসিকতা অবশ্যই অন্তরালে কাজ করছিলো। বাংলাদেশের আমরা চারজন সাংবাদিক ইরান সফরের আমন্ত্রণে তাই অত্যন্ত খুশী হয়েছিলাম। ৩৩শে অক্টোবর সারাটা দিন আমাদের খরচ হয়ে গেল আনুষংগিক কাজকর্ম সমাধা করতে। ঐ রাতেই ফ্লাইট। বিমানের বোয়িং চেপে রওয়ানা হলাম ইরানের উদ্দেশ্যে। দুবাই পর্যন্ত একটানা ফ্লাইট। প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে প্রায় ২৪ ঘন্টা বিরক্তিকর অবস্থান শেষে ৩১শে অক্টোবর রাত প্রায় বারোটায় তেহরানগামী ইরান এয়ার লাইনের জাম্বো জেট-এ সওয়ার হলাম। বিশাল বপু বিমানটি ভোর সাড়ে তিনটায় আমাদের উগড়ে দিল মেহরাবাদ বিমান বন্দরে। ফ্লাইটের অস্বাভাবিক বিলম্বের কারণে বিমানবন্দরে যাদের আশা করেছিলাম তাদের কাউকে দেখা গেলো না। অগত্যা আমরা নিজেরাই বারোশ' রিয়াল (বারো ডলার) ভাড়া দিয়ে একটি ট্যাক্সিযোগে পর্যটন কেন্দ্রের নির্দেশমত একটি হোটেলে গিয়ে উঠলাম। তখন ভোরের বাতাসে বেশ শিরশিরে ঠান্ডা।

আমরা চারজন। আমি, বাংলাদেশ টুডে'র সেলিম সামাদ, স্বদেশ-এর

www.pathagar.com

হাসনাত করিম পিন্টু ও দৈনিক-দেশ শেখ মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম। ছুরির ফলার মত প্রথম সূর্যালোকে তেহরানের শীতল আবহাওয়াকে বিদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গেই হোটেল ছেড়ে বাইরে বেরোলো সেলিম ও করিম। প্রায় আধঘন্টা পর ফিরে এসে বললো, রাস্তার পাশে ভিক্ষুক দেখলাম, কিউ দেখলাম রুটির দোকানে। মনে মনে হাসলাম। বিদেশীরা প্রথমত এটাই দেখতে চায়। বিপ্লবোত্তর যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের জন্যে এই চিত্র এমন কিছু লজ্জার নয়। ফরেন প্রেস ডিপার্টমেণ্টে টেলিফোন করে আমাদের উপস্থিতি জানাবার পরপরই বরাতি নামে এক স্বল্পভাষী তরুণ এলেন আমাদের নিয়ে যেতে। তার অনুগামী হয়ে আমরা ভ্যালিআসর এভেনুয়ের খসরু খবর স্ট্রীটে তেহরান কাওসার হোটেলে গিয়ে উঠলাম। মধ্যম শ্রেণীর এই হোটেলের সাবেক নাম 'তেহরান কিংস হোটেল।'

পরের দিন ভোরে এলেন নতুন দোভাষী আলী আর সাহেবেক-তিয়ারী। আমেরিকায় থেকে লেখাপড়া করেছেন। ইসলামী বিপ্লবের পর দেশে ফিরে দেশ ও জাতির খেদমতে নিয়োজিত। দুপুরের আগে আমাদের জন্যে কোন কর্মসূচী না থাকায় উত্তর তেহরানের গান্ধী এভেনুয়াতে গেলাম। রাষ্ট্রদূত নেই। চার্জদ্যি এফেয়ার্স আশ-ফাকুর রহমান ও ফার্স্ট সেক্রেটারী মাসুদ নিজামীর সাথে অনেকক্ষণ কাটালাম। বাংলাদেশের সঙ্গে ইরানের সম্পর্ক মধুর না হলেও বেশ হৃদ্যতাপূর্ণ। বাণিজ্যিক লেনদেন ক্রমেই বাড়ছে। বাংলাদেশের চা ও চটের বস্তা জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং সিগারেট বিপণের চমৎকার সুযোগ আছে। উল্লেখ্য যে, ইরানে কোনো সিগারেট বা মাদক জাতীয় পানীয় তৈরী হয় না। মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ এবং প্রকাশ্যে ধূমপান বন্ধ করার চেষ্টাও চলছে। বর্তমানে ইতালী থেকে দু'তিন ধরনের নিম্নমানের সিগারেট আমদানী করা হয়, যার মান আমাদের স্টার বস প্রভৃতির চেয়েও নিকৃষ্ট। 'বাহমান' ও 'আজাদী' নামে দু'ধরনের সিগারেটই বাজারে বেশী চালু। খোলাবাজারে এর দাম ১৫০ রিয়াল ও দু'শ' রিয়াল—অর্থাৎ দেড় ডলার ও দু'ডলার। পানীয়ের মধ্যে পেপসিকোলা ও জমজম এবং সুইট বিয়ার—যার নাম দিয়েছিলাম আমরা ইসলামিক ড্রিংক। খাবারের মধ্যে প্রধান ও জনপ্রিয় 'চেলো কাবাব'। আমাদের শিক কাবাব, পাটিসপটা পিঠার মত করে ভাজা। ঢেউটিনের মত লম্বা রুটি আর চাপাতি মূল খাদ্য। সাথে পানির,

www.pathagar.com

মাখন, জ্যাম, ডিম আর থাকে প্রচুর পরিমাণে সালাদের সব্জি, টমেটো, গাজর, শসা, লেটুস ইত্যাদি। লাঞ্চে ও ডিনারে মাখনের টুকরো সহযোগে ভাত, মাছভাজা, চেলো কাবাব বা রোস্টেড চিকেন। ইরানে চাল আসে থাইল্যান্ড ও পাকিস্তান থেকে। অস্ত্র, গোলা-বারুদ ও সমর সরঞ্জাম আসে চোরাপথে ইতালী, দক্ষিণ কোরিয়া ও ফিলিপাইন হয়ে। মোটর গাড়ী এরা নিজেরাই তৈরী করছে। জীপ, ট্রাক ও বাহন ট্যাক্সি, তারপরেই বাস। তেল সম্পদে সমৃদ্ধ এই দেশে মোটর গাড়ীর ছড়াছড়ি। সাধারণ মানুষের চলাচলের প্রধান যানবাহন ট্যাক্সি। তারপরেই বাস। বাসভাড়া আনুপাতিক হারে যথেষ্ট কম। আর পেট্রোলের দাম—আমাদের হিসেবে গ্যালন প্রতি ৫০ পয়সার বেশী নয় অর্থাৎ পানির দামের চেয়েও কম।

তেহরান নগরীতে সারাক্ষণ অফুরন্ত প্রাণচাঞ্চল্য। ব্ল্যাকআউট নেই, কার্ফু নেই, দিনে-রাতে চলাফেরায় কোনো বিধি-নিষেধ নেই। মনেই হয় না যুদ্ধরত ও যুদ্ধবিধ্বস্ত একটা জাতি। প্রত্যেকটি রাস্তায় হাজার হাজার মোটর গাড়ীর চলমান স্রোত। ফুটপাতে হাজারো মানুষ। যানবাহন চালচলনের নিয়ন্ত্রণও এক বিস্ময়কর ব্যাপার। জেব্রা ক্রসিং ছাড়াও যেকোন স্থান দিয়ে আপনি বিশাল রাস্তায় মোটর গাড়ীর ভিড়ের মধ্য দিয়ে একেবারে পার হয়ে যেতে পারেন। শুধু একবার বাঁ দিকে, তারপর ডান দিকে তাকিয়ে হাত ইশারা করলেই হলো। বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাঃ এটা কি করে হয়? সাংঘাতিক দুর্ঘটনা হওয়ার কথা। দোভাষী হাসিমুখে জবাব দিলেনঃ হয় না। আমাদের নিয়ম মানুষ, তারপর যানবাহন। পথটা মানুষের জন্যে গাড়ীর জন্য নয়। এরপর ইরানের যে ক'টি শহর সফর করেছি সেখানেই লক্ষ্য করেছি—সবার আগে মানুষ সত্য।

২রা নভেম্বর বিকেলে আবার বেরোলাম। সাবেক মার্কিন দূতাবাসের সামনে গিয়ে আমরা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলাম। বিশাল ভবনটি এখন বিপ্লবী রক্ষীবাহিনীর সদর দফতর। বিপ্লবের চতুর্থ বার্ষিকী উপলক্ষে তার দেয়ালে লিখন পড়ছে লাল কালির। ভেতরে প্রবেশের অনুমতি মিললো না। জাম্বিয়ার সাংবাদিক ইউসুফ ক্ষেপে গেলেন। তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, ভেতরেই যদি ঢুকতে না দেবে, তবে আমাদের এখানে নিয়ে এলে কেনো?

www.pathagar.com

বিভিন্ন দেশ থেকে আগত সাংবাদিক আমরা ছিলাম সংখ্যায় প্রায় পঁচিশ জন। একই হোটেলের বাসিন্দা। বাদবাকীরা ছিলো অন্য হোটেলে। কমপক্ষে ২০টি দেশের ৮০ জন সাংবাদিক এ সময় তেহরানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে।

ফেরার পথে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে আমাদের বাহন বাসটি চললো। পথে তখন হাজারো মানুষের মিছিল। বিভিন্ন শ্লোগান লেখা ব্যানার তাদের হাতে আর ইমাম খোমেনীর প্রতিকৃতি ও শহীদদের ছবি। মিছিলকারীদের কণ্ঠে শ্লোগান: মার্গবার আমরিকা, মার্গবার সৌরাভি, সৌদি ও সাদ্দাম। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার এই বিশাল মিছিলের পর এলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিছিল। প্রথমে কয়েক হাজার ছাত্র। তাদের পরে আপাদমস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা ছাত্রীদের মিছিল। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। আমাদের সাথে যে চারজন বিদেশীনী সাংবাদিক ছিলেন তাদের সর্বাঙ্গও কালো বোরখায় আবৃত। পরে অন্যত্র ছোট ছোট মেয়েদেরও একই অবস্থায় দেখেছি।

ফুলের মত কচিকাঁচা শিশু-কিশোরীকে বোরখার ভেতর দেখতে খুব ভালো লাগার কথা নয়। কৌতূহল ও বিরক্তি দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, কারণ কি? জবাব পেলাম: ছোটবেলা থেকে পর্দা-পুশিদার অভ্যাস গড়ে না উঠলে বড় হওয়ার পর মন-মানসিকতার সাথে খাপ খাবে না। লেবাননের দুই মহিলা সাংবাদিকের তো শুধু মুখ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। এমন কি হোটেলে খাবার টেবিলেও। তাদের মধ্যে একজন অনূঢ়া মিষ্টভাষী, অপরজন বিবাহিতা মুখরা। শেষের জন ইংরেজী বলতে পারেন। আবদান থেকে ফেরার পথে জাপানী সাংবাদিকের সাথে বাকযুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন তিনি। বললেন আগামী দশ বছরের মধ্যে ইনশাআল্লাহ্ সারা দুনিয়ায়, ইসলামী শাসন কায়েম হয়ে যাবে। পরক্ষণেই ব্যক্তিগত আক্রমণ: তোমরা তো বৌদ্ধ, ইসলামের কি বুঝবে? মুসলমান হয়ে যাও।

হাসতে হাসতে জাপানী বললেন, কেন ইসলামী শাসনের ভয়ে? আচ্ছা, দশ বছর অপেক্ষা করি।

মহিলা সাংবাদিক আবারো বললেন: দশ বছরের মধ্যেই বিশ্বের সব দেশ ইসলামী শাসনের আওতায় আসবে। তবে...

www.pathagar.com

জাপানী স্মিতহাস্যে বাকীটুকু জুড়ে দিলেন, অবশ্যই জাপান ছাড়া।

পরের দিন আমরা শাহের অন্যতম বিশ্বস্ত জেনারেল তুফানিয়ার বাসভবন ও বেহেশতী জাহরা (গোরস্থান) দেখতে গেলাম। জেনারেল তুফানিয়া বিপ্লবের পর পলাতক। তার পরিত্যক্ত ২৪ কামরার বিশাল প্রাসাদ এখন পঙ্গু হাসপাতালে রূপান্তরিত। বাড়ীর সামনে বিশাল লন, ফুলের বাগান ও সুইমিং পুল। শাহের আমল থেকে ইসলামী বিপ্লব পর্যন্ত অনেক পানি গড়িয়ে যাওয়ার পর সুইমিং পুলটি এখন জলশূন্য। এখানে আমরা যুদ্ধাহত পঙ্গু কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক ও সৈনিকের সাথে কথা বললাম। এখানে পরিচয় হলে স্পেনের ফ্রী লান্সার এক মহিলা সাংবাদিকের সাথে। সেলিম সামাদ করমর্দনের জন্যে হাত বাড়াতেই সে হাত গুটিয়ে বললো ঃ তোমার সাহস তো কম নয়। ইরানে এসে মহিলার সাথে হ্যান্ডশেক করতে চাও।

পঙ্গু হাসপাতাল থেকে যখন বেরুতে যাচ্ছি, সে সময় স্কুল ছাত্রীদের একটি মিছিল এসে ঢুকলো। সবার হাতে ফুল ও খাবার। জীবনকে বাজি রেখে যারা ইসলামী বিপ্লব সফল করে তোলার কাজে গিয়ে এখন পংগু তাদের প্রতি সহানুভূতি, মমত্ববোধে শ্রদ্ধার নিদর্শন বয়ে এনেছে এই ফুল ও ঘরে তৈরী বিভিন্ন খাবার।

বেহেশতী জাহরা তেহরান থেকে ১৫ কিলোমিটার দক্ষিণে। বিস্তৃত এলাকা জুড়ে শহীদদের এই সমাধি কেন্দ্র। কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার লোক জমায়েত হয়েছে এখানে। মার্বেল পাথরে বাঁধানো কবরের উপর দিয়ে আমরা সবাই জুতো পায়ে হেঁটে চলেছি, সিগারেট খাচ্ছি—সে এক আশ্চর্য মেলা। কবরের উপর দিয়ে হাঁটতে অবশ্যই আমাদের খারাপ লেগেছে। পরে জানলাম এর মাহাত্ম্য। ইরানীরা মনে করে, জীবিত মানুষের পদধূলি কবরের বাসিন্দাদের পাপ মোচনের সহায়ক।

কবরের উপর বসে মৃতের মা অথবা বাবা এবং অন্যান্য স্বজন আহাজারি করছে। পাশে রয়েছে ঝুড়ি ভর্তি আপেল, আনার বা খেজুর। সেগুলো বিলানো হয়েছে। এক শহীদের মা আমাদের খেজুর দিলেন আর তার শহীদ সন্তানের কথা বললেন। সেই সংগে অভিসম্পাত দিলেন আমেরিকা ও সাদ্দামকে। সর্বত্রই

www.pathagar.com

একই ভাষা, অভিন্ন অভিব্যক্তি—মার্গবার আমরিকা, মার্গবার সাদ্দাম।

জুমাবার ৪ঠা নভেম্বর। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লক্ষ লক্ষ লোকের জমায়েত। জুমার নামাযে আমরা ক'জন শামিল হলাম। নামাযের আগে ইরানী মজলিসের স্পীকার রাফসানজানি দীর্ঘ ভাষণ দিলেন। গত এক সপ্তাহে দেশ-বিদেশের ঘটনাবলী ও ইসলামী সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রম সবিস্তারে বর্ণনা করলেন। রাফসান-জানি বেশ উঁচুদরের বক্তা। রসিয়ে কথা বলতে জানেন। তাঁর কথায় লোক হাসে, কাঁদে, উত্তেজিত হয়।

ক্যাম্পাসের বিশাল অঙ্গন। বাঁশের খুঁটির উপর তেরপালের শামিয়ানা। উত্তরে-পূর্বে-দক্ষিণের বড় রাস্তার উপর জায়নামাজ বিছিয়ে হাজার হাজার লোক খুৎবা শুনছে। মাইক ব্যবস্থা প্রায় দু'মাইল বিস্তৃত। আমাদের দেশে বিশাল ঈদ-জামাতের মত। ব্যবস্থাটা নিঃসন্দেহে গণতান্ত্রিক। সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্যের যে ফারাক থাকে অর্থাৎ 'ইনফরমেশন গ্যাপ' সেটা পূরণ করার এমন চমৎকার ব্যবস্থা অন্য কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। সপ্তাহের সমস্ত ঘটনা আনুপূর্বিক ব্যাখ্যার ফলে সরকার ও সাধারণ মানুষের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ যেমন থাকে না, তেমনি বিরোধীয় পক্ষের জন্যে রাজনৈতিক কারণে জনগণকে বিভ্রান্ত করার সুযোগও থাকে নেহায়েত কম। রাজনীতি ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে প্রতি জুমাবারে ইরানের বিভিন্ন স্থানে এ ধরণের বিশাল গণজমায়েত হয়ে থাকে।

বিকেলে আমরা উত্তর তেহরানে হোটেল ইনকিলাবে গেলাম। এটি সাবেক হোটেল হিলটন। পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছোট এক টিলার উপর মনোরম পরিবেশে এই হোটেল ইনকিলাব। এর কয়েকটি কামরা নিয়ে আয়াতুল্লাহ্ হাকিমীর অফিস। তিনি হচ্ছেন ইরাকের বিখ্যাত ধর্মীয় নেতা আল্লামা তাবাতা'ইর পুত্র। 'বিপ্লবী ইরাক সরকারের সুপ্রীম কাউন্সিলার'—এই নামে তিনি এখান থেকে সংগ্রাম পরিচালনা করছেন। ইরাকের সকল ইসলামী শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করে বর্তমান বাগদাদ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার চেষ্টা চলছে। এর একটি যোদ্ধা শাখা ফ্রন্টেও যুদ্ধ করছে বলে আমাদের জানানো হলো। 'সুব্বা খায়ের'—গুড মর্নিং। ৫ই নভেম্বর ভোরে টেলিফোন

www.pathagar.com

করে ঘুম ভাঙালো রিসেপশনিস্ট। আমরা পবিত্র কোম শহরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলাম।

তেহরান থেকে ১৫০ কিলোমিটার দূরে কোম। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে চেপে আমরা রওয়ানা হলাম। বেহেশতী জাহরা বাঁয়ে রেখে আমাদের বাস এগিয়ে চললো উত্তর-পশ্চিম দিকে। বিশাল বিরান প্রান্তরের মধ্য দিয়ে মহাসড়ক। দু'পাশে উঁচু-নিচু পাহাড়। পাহাড় মানে শিলাস্তূপ। পাথরের বিশাল বিশাল চাই পড়ে আছে আশে-পাশে। জমিনে নুড়ি পাথরের ছড়াছড়ি। আড়াই ঘন্টায় আমরা কোম পেঁাছলাম। ১৮২ বছর আগে এখানে যে ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনী কায়দায়। তা-ই এখন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। আজ থেকে কুড়ি বছর আগে ইসলামী বিপ্লবের সূচনা হয় এখান থেকেই। কোমের-এর শিক্ষাই সর্বোচ্চ ধর্মীয় শিক্ষা। এখানে ১২ বছর বিদ্যাভ্যাসের পর ডিগ্রী দেয়া হয় 'হুজ্জাতুল ইসলাম' ১৫ বছরের পর 'আয়াতুল্লাহ্', ২৫ বছর পর 'আয়াতুল্লাহ্ আজমা'। বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদান ও পরিচালনায় নিয়োজিত রয়েছেন আয়াতুল্লাহ্ মুন্তাজারি ও আয়াতুল্লাহ্ মিসকিনি।

আবাসিক প্রায় এক হাজার ছাত্র এখানে অধ্যয়নরত। তাদের মধ্যে বিদেশী ৬ শতাধিক। ছাত্ররা বিনামূল্যে শিক্ষা গ্রহণ করে, তবে খাবার খরচ বহন করতে হয় তাদের নিজেদের।

কোম শহর মরুময় ধূসর প্রান্তরের মধ্যে অবস্থিত। কেন্দ্রস্থলে বিস্তৃত এলাকার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ এবং একটি প্রাচীন মাজার। মাজার মধ্যে রেখে বিরাট আয়তনের মসজিদ। ভেতরে তার দেয়াল ও গম্বুজে মনোরম কারুকাজ। মন-প্রাণ জুড়িয়ে যায়। মসজিদের সামনেই দেখা পেলাম বাংলাদেশী শামসুদ্দীন আহমদের। কুষ্টিয়ায় বাড়ী। দশ-বারো বছর ধরে এই কোমে আছেন। ইরানী মেয়ে বিয়ে করে ঘর-সংসার পেতেছেন। বেশ সুখেই আছেন তিনি।

ইরান যে যুদ্ধরত বাইরে থেকে তা বোঝার উপায় নেই শহর থেকে। তেহরান ও আহ্ওয়াজ নগরীতে এত প্রাণ প্রাচুর্য যে সেখানে যুদ্ধের আয়োজন বা বিভীষিকা অনুপস্থিত। শুধু মাঝে মধ্যে মিছিলের শ্লোগান উচ্চকিত হয় আকাশ-বাতাস। তবে আবাদান, খুররম শহর ও

www.pathagar.com

দেজফুলে ভিন্ন চিত্র। সেখানে যুদ্ধের থাবা যে ক্ষত সৃষ্টি করেছে তা এই দশকে মুছে ফেলা যাবে কিনা সন্দেহ।

৬ই নভেম্বর ব্রেকফা'স্ট সেরে আমরা তেহরানের প্রায় কেন্দ্রস্থলে যুদ্ধবন্দী শিবিরে গেলাম। আমাদের অভ্যর্থনা করেন হিসমতিয়া গ্যারিসনের কামান্ডার কর্ণেল মোহাম্মাদ বাকের তাহেদী। ৭ হাজার ইরাকী যুদ্ধবন্দীকে রাখা হয়েছে এই গ্যারিসনের বিভিন্ন শেডে। চার-পাশে কাঁটা তারের বেড়া।

আমরা যেতেই চারপাশ থেকে শ্লোগান ওঠলো ঃ আল্লাহু আকবার, ইসলামী বিপ্লব জিন্দাবাদ, মার্গবার আমরিকা, মার্গবার সাদ্দাম ইত্যাদি।

এক ঝাঁক সাংবাদিক ক্যামেরা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো বিভিন্ন কায়দায় ছবি নেয়ার জন্যে। তুরস্কের শরীফ মোহাম্মদ একটা চিনার গাছের মগডালে ওঠে গোটা এলাকার ভিউ ধরে রাখলো। নীচে থেকে আরো কয়েকজন সাংবাদিক তাদের ক্যামেরা তুলে দিলো তার হাতে ছবি নেয়ার জন্যে। খুব আনন্দময় ছেলেটা। যুগোশ্লাভিয়ার সাংবাদিক আরে বেশী উচ্ছ্বল ও প্রাণবন্ত। সে বললো, অল প্যারটস।

পাকিস্তানের জাসারত পত্রিকার সাংবাদিক ফাতমী বললো ঃ যুদ্ধ বন্দীদের দিয়ে তোমরা শ্লোগান দেওয়াচ্ছো, এটা জেনেভা কনভেনশন বিরোধী। কমান্ডার বললেন ঃ আমরা তাদের উপর কোনো চাপ সৃষ্টি করি নি। তারা ইমাম খোমেনীর গুণমুগ্ধ হয়ে এবং ইরানীদের ব্যবহারে তুষ্ট হয়ে নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এটা করছে।

আমরা ক'জন যুদ্ধবন্দীকে এ কথা পরে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাদের একই জবাব ঃ ইরাকে সৈনিক থাকতে যে ব্যবহার পাই নি ইরানে যুদ্ধবন্দী হয়ে তা পাচ্ছি।

একদল যুদ্ধবন্দী আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে কাওয়ালী গাইলো। যুদ্ধের কাসিদা। শহীদের জীবন, যোদ্ধার কর্তব্য ও দায়িত্ব এর বিষয়-বস্তু। সবার উর্ধ্বে ইসলাম—যার জন্যে জান কবুল।

অপর একটি ক্যাম্পে ঢুকে দেখলাম, একটার উপর আরেকটি সাজিয়ে ৬টা লোহার খাটে বিছানা। এক সাথে নীচে দু'জন, মধ্যে দুজন ও উপরে দু'জন ঘুমাতে পারে। যুদ্ধবন্দীদের মধ্যে যারা নিরক্ষর ও স্বল্প

www.pathagar.com

শিক্ষিত তাদের জন্যে উস্তাদ রাখা হয়েছে। তাদের আমরা গ্রুপে গ্রুপে ক্লাস নিতে দেখলাম।

ইরানে এ পর্যন্ত ৭০ হাজার যুদ্ধবন্দী আছে বলে আমাদের জানানো হলো। ইরানের বিভিন্ন স্থানে তাদের রাখা হয়েছে এবং ইসলামী ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুযায়ী তাদের ইরানী সৈনাদের মতোই খাবার দেয়া হচ্ছে।

বাগদাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও ইরাকী বাহিনীর সাবেক মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ হাসানের সাথে আমাদের কথাবার্তা হলো। বয়সে তরুণ। তাঁকে প্রশ্ন করা হলো—তুমি ইরাকের পক্ষ হয়ে তোমার জন্মভূমির স্বার্থে যুদ্ধে শরীক হয়েছিলে। তবে এখন কেন ইরাকের বিরুদ্ধে শ্লোগানে শামিল হচ্ছো ? জন্মভূমির বিরুদ্ধাচারণ কি অপরাধ নয় ? জবাবে সে বললো—আমি জন্মভূমি বা দেশবাসীর বিরুদ্ধাচরণ করছি না। করছি নীতিভ্রষ্ট শাসকগোষ্ঠির বিরুদ্ধে।

বিকেলে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো লোকমানদ্দৌলা হাসপাতালে। এখানে যুদ্ধকালীন রাসায়নিক বোমা বিস্ফোরণে আহত কয়েকজনকে দেখলাম। প্রায় সবারই গায়ে দগদগে ঘা। একটি কিশোরের দুচোখের দৃষ্টি নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো। এখন সে কিছু কিছু দেখতে পাচ্ছে। ডাক্তার বললেন, সঙ্গে সঙ্গে ওকে হাসপাতালে আনায় সুবিধা হয়েছে। দু'তিন মাসের মধ্যে তার দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক হয়ে যাবে ইনশা-আল্লাহ্।

ইরান যুদ্ধ বন্ধ করতে চায় না। তাদের বক্তব্য যুদ্ধ বন্ধের জন্যে ইরানী পূর্ব-শর্ত ইরাক মেনে মিলেই হয়। যুদ্ধের জন্যে শহরের তরুণদের এবং মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী সমাজের তেমন মাথা ব্যথা নেই। যুদ্ধ করছে দেহাতী মানুষ—গ্রামাঞ্চলের অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোক, যারা ইসলামী বিপ্লবের সার্থকতার জন্যে নিজের প্রাণ বিলিয়ে দিচ্ছে হাসিমুখে ইসলামের জন্যে আর তার পরিবারের লোক ধন্য হচ্ছে, গর্বিত হচ্ছে সেই আত্মত্যাগে। সে এক মাদকতা—ধর্মীয় মাদকতা।

দেখতে দেখতে একটা সপ্তাহ কেটে গেলো তেহরানে। গ্রাম আর গ্রামের মানুষ এবং তাদের জীবনযাত্রা দেখার উদগ্র আকাঙ্খায় আমরা বারে বারে বাইরে যাওয়ার কথা বলছিলাম। বলেছিলাম, ইমাম খোমেনীকে না দেখলে ইরান দেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কুর্দিস্তানে যেতে

www.pathagar.com

না পারলে ভিনদেশের প্রচারণাকেই সত্য বলে মেনে নিতে হচ্ছে। শহর দেখে গ্রাম বোঝা যায় না। বোমা গোলার আওয়াজ কানে না এলে যুদ্ধের কথা জানবো কি করে ?

অবশেষে আমাদের দুটো অনুরোধ মঞ্জুর হলো। আমরা ৭ই নভেম্বর গ্রামে গেলাম এবং সফরের শেষপদে রণাঙ্গনে। তেহরান থেকে ২৩ কিলোমিটার দূরের গ্রাম ফালাশত। অদূরেই একেবেঁকে গেছে নদী। তার দুপাশে নুড়ি পাথরের রাজ্য। প্রথম দর্শনে মনে হয়, এগুলো বুঝি ধান পাটের মতই আবাদ হচ্ছে। ট্রাক আসছে যাচ্ছে নুড়িপাথর নিয়ে। রাস্তা নির্মাণ ও মেরামতের কাজ কত সহজ এখানে। নদীর কিনারে দাঁড়ালাম আমরা। ক্ষীণতোয়, স্বচ্ছ পানি হিম শিতল। সড়কের দু'পাশে সব্জীক্ষেত আর কাপাসি ক্ষেত। যারা আগে কখনো কাপাসি দেখেনি তারা ছুটে গিয়ে গোটা ভেংগে কাপাসি তুলে নিয়ে এলো।

ফালাশত মরুময় এলাকা। পাথর, কাঁকর আর বালির রাজ্য। পাকা নালা তৈরীর প্রকল্পের কাজ চলেছে। প্রকল্প প্রধান সৈয়দ আবুল ফজল হোসেন এলাকার প্রধান ইমাম। তিনি জানালেন, এস্কিমোদের মত ছোট ছোট মাটির ঘরে বাস করতো এই গ্রামের মানুষ। সেগুলো ভেংগে এখন নতুন পাকাবাড়ী তৈরী করা হয়েছে। এ কাজে স্থানীয় জনগণ উদ্যোগী হয়ে প্রথমে মাত্র ৫০ হাজার তুমান (১০ তুমানে এক ডলার) চাঁদা সংগ্রহ করে। পরে তার সাথে যোগ হয় সরকারী মঞ্জুরী। খাবার পানির ট্যাংক বসেছে, বিদ্যুৎ এসেছে। টেলিভিশন ও ফ্রিজের ব্যবহারের রপ্ত হয়েছে পল্লীর মানুষ। ইরানের পল্লীর মানুষ আর আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশের গ্রামের মানুষের জীবনধারায় তেমন কোনো তফাৎ নেই। তফাৎটা চোখে পড়ছে এখন—ফ্রিজ আর টেলিভিশন ব্যবহারের সৌজন্যে।

যেখান থেকে আরো ৫/৭ কিলোমিটার দূরে পথের ধুলোয় ঘূর্ণি তুলে আমাদের বাস দু'টো গিয়ে পেঁছিলো জাফরাবাদ গ্রামে। তিনটি দেয়াল ঘেরা বসতি মিলে এই গ্রাম। মাটির ঘরের পাশাপাশি উঠছে পাকা বাড়ী। পুরনো ঘরগুলো একেকটা দুর্গের মত। ভেতরটা অবশ্য সৌখিন ও আরাম-আয়েশের উপকরণের জৌলুশে সমৃদ্ধ। মাটির নীচে হাম্মাম বা গোসলখানা। মোট জনসংখ্যা মাত্র দেড় শ'।

www.pathagar.com

ক্ষেত থেকে টাটকা শশা এনে খাওয়ানো হলো আমাদের। বরফ দেয়া পানিও দিলো সাথে। ময়দার মত পুরু এক হাটু ধুলোবালি ভেঙ্গে আমরা গোটা এলাকাটা ঘুরে ঘুরে দেখলাম। অনেক দূরে সারিবদ্ধ-ভাবে দাঁড়িয়ে কিশোর-কিশোরীরা ভিনদেশের সাংবাদিক পরিচয়ের মানুষগুলোকে দেখলো কৌতূহলের দৃষ্টি দিয়ে।

পরে জেনেছি, সমগ্র পল্লী অঞ্চল ইমাম খোমেনী এবং ইসলামী বিপ্লবের একনিষ্ঠ সমর্থক। শহর-বন্দরে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। অনেকেই ধর্মের নামে এতটা কড়াকড়ি পছন্দ করে না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। বিপ্লবের পর এই আয়েশী শ্রেণীর সামাজিক আধিপত্যের বিলুপ্তি ঘটেছে। এই শ্রেণীর দু'একজনের সাথে আমাদের আলাপ হয়েছে। একজন ব্যবসায়ী আগ্রহ প্রকাশ করলেন, বাংলাদেশে বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগের পরিস্থিতি জানতে। সেই সংগে এ প্রশ্নটাও রাখলেন ঃ ওখান থেকে আমার ছেলে-মেয়েদের আমেরিকায় রেখে লেখাপড়া শেখাতে পারবো তো ?

ইরানে ভিন্ন মতাবলম্বী আছে। প্রথম দিকে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হলেও বর্তমানে কড়াকড়ি অনেকটা শিথিল। তবে সতর্ক দৃষ্টি আছে বিপ্লবের পর সৃষ্টি বিভিন্ন ক্যাডারের। ইসলামী গাইডেন্স. পাসদারান ও হিজবুল্লাহ্—এসব ক্যাডার সর্বক্ষণ সর্বত্র সতর্ক অবস্থায় থাকে। সুতরাং পান থেকে চুন খসার উপায় নেই। জাতির জন্যে ইমামের যে ৮ দফা নির্দেশ আছে তার অন্যতম হলো—সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রমাণ ছাড়া কাউকে গ্রেফতার করা যাবে না। প্রশাসনে দক্ষ লোকের অভাবে দৈনন্দিন রাষ্ট্রীয় কাজ পরিচালনায় অসুবিধে হচ্ছে প্রচুর। তবে নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকদের মনোবলও প্রচন্ড।

ইরানে বিপ্লবোত্তরকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম প্রধান দু'টি কল্যাণ ফাউন্ডেশন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্যে কৃতিত্বের দাবিদার। এর একটি হচ্ছে বুনিয়াদ মুজাতাদআফিন বা দুঃস্থ কল্যাণ ফাউন্ডেশন। এবং অপরটি বুনিয়াদে শহীদ বা শহীদ পরিবার ফাউন্ডেশন। পরিত্যক্ত কল-কারখানা এবং অন্যান্য ব্যবসায় ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের এরা তত্বাবধায়ক। ১০ই নভেম্বর মুজতাদআফিন ফাউন্ডেশনের পরিচালক মাহদী তাবাতাবাই'র সাথে আমাদের আলোচনা হলো। শাহের পরিবার

www.pathagar.com

এবং আত্মীয়-স্বজনের এবং সাবেক আমলের প্রতাপশালী ভূস্বামীদের পরিত্যক্ত প্রাসাদ, ভবন, জমি-জমা ও ধনরত্নসহ বিভিন্ন কল-কারখানা শিল্প ইউনিট, সিনেমা-থিয়েটার প্রভৃতি এই ফাউন্ডেশনের আওতাভুক্ত। শিল্প কারখানা ছোটবড় মিলিয়ে অন্যূন ৫ হাজার। এগুলো আবার ১০টি গ্রুপে বিভক্ত করা হয়েছে। বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান আছে ২ শতাধিক। আর বাসভবনের সংখ্যা হবে প্রায় ১৫ হাজার। এছাড়া ৫০টি বৃহৎ খনি এবং ১২০টি উন্নয়ন ও নির্মাণ ইউনিট এই ফাউন্ডেশন পরিচালনা করছে। উল্লেখ যে, বিদেশী পুঁজি বা শেয়ারে পরিচালিত শিল্প-কারখানার মধ্যে মোটরগাড়ী ও টায়ার নির্মাণ, বাস-ট্রাক-ট্রাক্টর নির্মাণ কারখানাগুলো এই সংস্থা দক্ষতার সাথে পরিচালনা করছে। লাক্সারী কোচ ও জীপও ইরানে তৈরী হয়। এতে সহায়তা করছে কয়েকটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান। অবশ্য জীপের ইঞ্জিন সরাসরি ভারত থেকে আমদানী করা হচ্ছে।

মুজতাদ আফিন ফাউন্ডেশন এ-পর্যন্ত পল্লী অঞ্চলে স্বল্পব্যয়ে ৫০ হাজারের মত ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে দুঃস্থদের পুনর্বাসন করছে। জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা ও অন্যান্য কল্যাণধর্মী কাজেও এই ফাউন্ডেশনের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ইসলামী বিপ্লবের মাত্র ২০ দিন পর ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ খোমেনীর নির্দেশে এই সংস্থা গঠন করা হয় এবং এখন পর্যন্ত এর সমস্ত কার্যক্রমের হিসেব-নিকেশ তাঁর কাছেই পেশ করতে হচ্ছে। কুর্দিস্তান, সিস্তান, বালুচিস্তান, ইলাম ও অন্যান্য এলাকার দুঃস্থ কল্যাণ উন্নয়নের ওপর এই সংস্থা সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে বলে আমাদের জানানো হয়। এসব এলাকার ভূমিহীনদের মধ্যে এক লক্ষ ৫০ হাজার বর্গ হেক্টর জমি বন্টন করা হয়েছে।

সিনেমা ও অপেরা থেকে আয় হালাল হিসেবে গণ্য করা হয় কিনা জানতে চাইলে পরিচালক মাহদী তাবাতাবাই বলেন, আমরা মনে করি এটা হালাল। কারণ সিনেমা ও অপেরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির অংগ। ভবিষ্যতে আমরা সেরা চলচ্চিত্র নির্মাণ করবো, ইনশা-আল্লাহ।

৯ই নভেম্বর সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় প্রেসিডেন্ট খামেনীর সংবাদ সম্মেলন। কড়া নিরাপত্তা-বেষ্টনীর মধ্যে ঢোকার আগে আমাদের হাতের ঘড়ি, আংটি এবং পকেটের কলম কাগজ যাবতীয় দ্রব্য একটা

www.pathagar.com

করে সিলোফিন ব্যাগে ভরে নিরাপত্তা রক্ষীর কামরায় জমা দিতে হলো। যাদের ক্যামেরা ছিলো তারা একদিন আগে তা জমা দিয়েছিলেন। তারপর তিন-চার জায়গায় আমাদের দেহ তল্লাশি করা হলো।

কড়া ফ্লাডলাইটের মধ্যে আধঘন্টা বসে থেকে ঘেমে ওঠেছিলাম। এমন সময় প্রেসিডেন্ট খামেনী এলেন। শান্ত সৌম্য দর্শন ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোক। স্মিত হাসিতে মুখমন্ডল উজ্জ্বল। সংক্ষিপ্ত ভাষণে তিনি বললেনঃ "ইরানে ইসলামী বিপ্লবের বাস্তবতাকে সঠিকভাবে তুলে না ধরায় যতটা না ইরানী জনগণের ক্ষতি হচ্ছে তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হচ্ছে অন্যান্য দেশ ও জনগণের।"

তবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা তিক্ত বড়ি ইরানকে হজম করতে হচ্ছে। ইরানের দ্রব্যমূল্য গগনচুম্বী। প্রথম কারণ যুদ্ধ, দ্বিতীয় কারণ বাজার নিয়ন্ত্রণে অনভিজ্ঞতা, তৃতীয় কারণ, বলগাহীন মুদ্রাস্ফীতি। মারকেজী ব্যাংক বা কেন্দ্রীয় ইসলামী ব্যাংকের গভর্নর মোহসিন নূর বখশের মতে মুদ্রাস্ফীতি ঘটেছে ২০ থেকে ২৫ ভাগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাস্ফীতি শতকরা ২শ' থেকে ৩শ' ভাগ হবে বলে ব্যবসায়ী মহলের অভিমত। অবশ্য ওপেক সদস্য দেশ হিসেবে ইরানে আগেও দ্রব্যমূল্য চড়া ছিলো।

ইরানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ২, ৩ বিলিয়ন ডলার। দায় ৬ বিলিয়ন ডলার এবং দায় পরিশোধ ঘাটতির পরিমাণ শতকরা ৬০ ভাগ। বিপ্লবের শুরুতে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ১৫ বিলিয়ন ডলার। গত চার বছরে ৫ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে।

গভর্ণর মোহসিন নূর বখশ জানালেন, জন-কল্যাণের লক্ষ্য সামনে রেখে যুদ্ধের ধকল কাটিয়ে উঠার জন্যে দু'টি মহতী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। একটি সস্তাদরে দরিদ্রের মধ্যে জমি বিক্রি এবং অপরটি শহীদ রেজাই পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হবে।

ইরানে পরীক্ষামূলকভাবেই 'কর্জুল হাসনা' বা সুদমুক্ত ঋণের ভিত্তিতে ইসলামী ব্যাংক চালু হয়েছে। শিল্প-ঋণ হবে প্রফিট-শেয়ারের ভিত্তিতে। বাণিজ্যিক ঋণের পরিমাণ হ্রাস করে বর্তমান সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে কৃষি ও শিল্প খাতে।

www.pathagar.com

বিপ্লবের সময় মারকেজী ব্যাংকের সম্পদ ছিলো ৮০ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে আমানত বৃদ্ধির হার শতকরা ২৮ ভাগ। শিল্প-খাতে প্রবৃদ্ধির হার ১৪,৮ ভাগ। তেল রপ্তানী খাতের আয় দিয়ে পোষাচ্ছে না বলে বাজেট ঘাটতির হার হচ্ছে শতকরা দশভাগ। মোট বাজেট বরাদ্দের শতকরা ৩০ ভাগ যাচ্ছে যুদ্ধখাতে। মোট বাজেট বরাদ্দ ৩২০ বিলিয়ন ডলার। গত বছর যুদ্ধের দরুন সাধারণ ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৫০ বিলিয়ন ডলার। অবশ্য এর মধ্যে বাসভবন বিধ্বস্তজনিত ক্ষতি ধরা হয় নি।

ইরান প্রতি বছর খাদ্য চিনি, মাংস প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানী খাতে ব্যয় করছে ৯ বিলিয়ন ডলার। তেলের উৎপাদন ও রফতানী আগের চেয়ে কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। আগে যেখানে দৈনিক ৭০ থেকে ৬৫ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদন হতো এখন তা হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২৫ লাখ ব্যারেল।

আমেরিকায় শিক্ষিত ও ডক্টরেট প্রাপ্ত ৩৫ বছরের তরুণ গভর্নর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে দৃঢ় আশাবাদী। তিনি বললেন, "মুদ্রা-স্ফীতির বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম চলছে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নতুন এক মডেল সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। আমাদের অভিজ্ঞতা কম থাকতে পারে কিন্তু আত্মপ্রত্যয়ে আমরা বলিষ্ঠ। পরিচালিত সংগ্রামে জয় আমাদের অবধারিত।"

তেহরান থেকে আহওয়াজের দূরত্ব প্রায় ৮৮০ কিলোমিটার। খুজিস্তান প্রদেশের এই রাজধানী শহরের সাথে তেহরানের একমাত্র যোগাযোগ মাধ্যম এখন জংগী বিমান। এতে করেই টিকেট কেটে লোকজন যাতায়াত করে।

১১ই নভেম্বর ভোর ছ'টায় আমরা মেহরাবাদ বিমান বন্দরে গেলাম। প্যাসেঞ্জার লাউঞ্জে তখন ইরানের শাহের অতীত কার্যকলাপের ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র দেখানো হচ্ছে। নিক্সন, জিমি কার্টার, জর্দানের বাদশাহ, সম্রাট হেইলে সেলাসি, আনোয়ার সাদাত—এঁদের সাথে শাহের অন্তরঙ্গতা অভ্যর্থনার জাঁক-জমক, করোনেশনের সময় বিপুল উৎসব অনুষ্ঠান—একের পর এক দেখানো হলো। তার পাশে পাশে ইরানের সাধারণ মানুষের দুর্দশা। ভাষ্যকার বলে যাচ্ছেন, জনগণের সম্পদ নিয়ে শাহ

www.pathagar.com

ছিনিমিনি খেলছেন, তখন অন্যদিকে সাধারণ মানুষ দারিদ্রের পেষণে মানবেতর জীবন-যাপন করছে।

দু'দিন আগে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়েছিল শাহের সায়েদাবাদ প্রাসাদ ও নিভারণ প্রাসাদে। রাজপ্রাসাদ এখন সাধারণ মানুষের দর্শনীয় যাদুঘর। নাম 'দি পিপলস প্যালেস মিউজিয়াম।' একশ দশ হেক্টর এলাকা জুড়ে প্রাসাদ আঙিনায় নানা জাতের বৃক্ষরাজির মধ্যে রয়েছে ২৬টি ভবন।

দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের নেপথ্য সুর বাজছে প্রাসাদের প্রবেশ পথে। চারদিক স্তব্ধ, শান্ত। বিশাল পাহাড়ের পাদদেশে হিম শীতল প্রাসাদ চত্বরে আমরা পা রাখলাম। প্রবেশ পথের কাছেই কাঠের ফ্রেমে বাঁধানো আলোকচিত্র প্যানেল। এখানে ঠাঁই পেয়েছে শাহানশাহ রেজা শাহ পাহলভীর অতীত কর্মতৎপরতা এবং অন্তিমশয্যায় শায়িত আলোকচিত্র।

ইসলামী বিপ্লবের কর্ণধারদের অবশ্যই প্রশংসা করতে হয়। কেননা বাংলাদেশের মত তারা অতীত ইতিহাসকে মুছে ফেলতে বা বিকৃত করতে চেষ্টা করেন নি। ইতিহাসকে অবিকল ধরে রেখে তার পটভূমিকায় এই বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা ব্যাখ্যা করেছেন জনগণের কাছে। শাহের গণবিরোধী ভূমিকার নিন্দা করা হচ্ছে, কিন্তু ইতিহাস থেকে তাঁকে নির্বাসন দেয়া হয় নি। অতীত মুছে গেলে ভবিষ্যতের সেতুবন্ধ নির্মিত হয় কিভাবে? তাই চলচ্চিত্র ও আলোকচিত্রের প্রদর্শনীতে ইরানীরা ধরে রেখেছে তাদের অতীতের ইতিহাস। আমরা বাঙ্গালীরা পারি নি। আমাদের দুর্ভাগ্য অতীতের তরুণরা স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস এখনো জানতে বা পড়তে পারছে না। স্বাধীনতার ঘোষণা কে দিলো তাই নিয়ে এখনো রাজনৈতিক অভিসন্ধিতে বিতর্ক চলে।

ইরানী বিপ্লবের মহানায়ক ইমাম খোমেনী বা তাঁর সহচররা সত্যকে চাপা দেন নি। বরং দুর্বার গতিতে কঠিন সত্যের মোকাবিলা করছেন অকুতোভয়ে। তাই মজলিসে বিস্ফোরণের ফলে একসাথে ৭২ জন নেতা শহীদ হয়ে গেলেও নেতৃত্বের শূন্যতা দেখা দেয় নি। কর্মীদের মধ্যে বিভেদের বীজ উপ্ত হয় নি। ইরানী জাতির এই শিলাদৃঢ় ঐক্য সংহত আছে বলেই তারা এখনো একই সঙ্গে সবগুলো পরাশক্তির

www.pathagar.com

বিরোধিতায় সোচ্চার-কণ্ঠ হতে পারছে। তাদের বক্তব্য, আগে মানুষ সত্য। মানুষ আর তার আদর্শ আগে। রাজনীতি ও কূটনীতি পরের কথা। যতদিন পরাশক্তিগুলো ছোটখাটো অন্য দেশের প্রতি তাদের নীতির পরিবর্তন না ঘটাচ্ছে, ততদিন ইরানের আকাশে-বাতাসে উচ্চকিত শ্লোগান চলতেই থাকবেঃ মার্গবার-আমেরিকা, মার্গবার—সোরাভি।

টেলিভিশনে শাহানশাহের চলচ্চিত্র শেষ না হতেই আমাদের ডাক পড়লো। চেকিং শেষে বিমান বাহিনীর একটি ট্রুপ ক্যারিয়ারে গিয়ে উঠলাম। আমরা পঁয়ত্রিশ হাজার মিটার ওপর দিয়ে আড়াই ঘন্টায় গিয়ে পেঁছলাম আহওয়াজ বিমান বন্দরে। আমাদের সাথে কয়েকজন সাধারণ বেসামরিক যাত্রীও ছিলো।

ধুলো-বালির শহর আহওয়াজ। আবহাওয়া বাংলাদেশের নভেম্বরের প্রথম পক্ষের মত। হোটেল নাদেরী বুক করা ছিলো আমাদের জন্যে। মধ্যাহ্ন ভোজের পর শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাসে চেপে আমরা দক্ষিণে বেহবাহন শহরের দিকে রওয়ানা হলাম।

বেহবাহান খুজিস্তান প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলের শহর। আহওয়াজ থেকে একশ' কিলোমিটার দূরে। দিগন্ত বিস্তৃত জনবসতিহীন প্রান্তরের মাঝখান দিয়ে মহাসড়ক। চারপাশে ছোট-বড় পাথুরে পাহাড়। গাছ-পালা নেই, আছে কাঁটাগুল্ম। তা-ই খুটে খুটে খাচ্ছে দুম্বা ও ভেড়ার পাল। গাধা ও উটের বহরও চোখে পড়লো।

মাঝপথ পেরিয়ে গেলে হরমুজ নদী। খালের মত ছোট। খর-স্রোতা ও স্বচ্ছ। পুল পেরিয়ে দেউর গ্রাম। খেজুর বনের মধ্যে মাটির ঘর ও পাকা ভবন মিলে গুচ্ছ গ্রাম। নদীর দু'পাশে সব্জি ক্ষেত ও ধান ক্ষেত। ধান দেখে প্রাণ নেচে উঠলো। অনাবাদী এই বিরান প্রান্তরে এইটুকু স্থানই নয়নাভিরাম। এত জমি আমাদের থাকলে আমাদের চাষী ভাইদের মুখে হাসি ফুটতো!—হা-অন্ন! হা-অন্ন! রব উঠত না ফি বছর।

বেহবাহান শহরের ওপর ইরাকের রকেট হামলা হয় প্রথম ২৬শে অক্টোবর এবং দ্বিতীয় হামলা আসে ৫ই নভেম্বর। স্কুলের উপর রকেট এসে পড়ায় ভবনটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে ৯০ জন ছাত্র নিহত এবং ১১৯ জন আহত হয়। আমরা বিষণ্ন মনে ধ্বংসস্তূপের উপর

www.pathagar.com

দিয়ে হাঁটছিলাম। সে সময় একদল স্কুল ছাত্র মিছিল করে শ্লোগান দিচ্ছে ঃ "তোমাদের হাতে অস্ত্র, আর আমাদের আছে অটুট ধর্ম-বিশ্বাস।" ধ্বংসস্তূপের ওপর বিরাট ব্যানারে লাল কালিতে লেখা ছিলো "বিদেশী সাংবাদিকগণ আপনাদের যদি ধর্ম বিশ্বাস না থাকে, তবে অন্তত বিবেকবান হোন।"

রাতে আহওয়াজে ফিরে এসে শহর পরিক্রমণে বেরোলাম। লোকজন কম, তবে দোকান-পাটের জৌলুস আছে। যুদ্ধের জন্যে ব্যবসায়ী মহল চিন্তিত। তারা এর অবসান কামনা করে। আহওয়াজের একটা বৈশিষ্ট্য চোখে পড়লো। বেশ কিছু লোককে আরবী পোশাকে দেখলাম। আর পথের মোড়ে বা দেয়ালে ইমাম খোমেনীর ছবি এবং ইসলামী বিপ্লবের শ্লোগান তেমন দেখা গেলো না।

পরের দিন অর্থাৎ ১২ই নভেম্বর। সাংবাদিকদের নিয়ে যাওয়া হলো দেজফুলে। আহওয়াজ থেকে এই শহরের দূরত্ব ১৫০ কিলো-মিটার। মহাসড়কের পাশেই গড়ে উঠেছে নতুন শিল্প এলাকা পারস ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গ্রুপ। দুপাশে উর্বরা মাটি—ক্ষেতে শশা, তরমুজ ও খরমুজের আবাদ। এক জায়াগায় তিল, গম ও ধান মাড়াইর দৃশ্য দেখলাম। মহিলারা বাংলাদেশে মতই কুলো দিয়ে গম ও ধান উড়াচ্ছে। বিরল বৃক্ষের এই অঞ্চলে মাঝে মধ্যে বাবলা ও পাইন জাতীয় বৃক্ষ।

দেজফুল ও মোস্তফা খামিনী শহরকে ধ্বংসস্তূপ বললে অত্যুক্তি হয় না। গভর্ণর শেখ মুসাভি জানালেন, চারবার এই শহরের ওপর আক্রমণ হয়েছে। মোস্তফা খামেনী মসজিদের জন্যে এই শহরটিকে পবিত্র নিরাপদ মনে করে। তাই বারবার আক্রমণ সত্ত্বেও লোকজন শহর ছেড়ে চলে যায় নি। সীমান্তবর্তী এই শহরে সাম্প্রতিক রকেট হামলায় ১৩ জন নিহত ও ৬০ জনের মত আহত হয়েছে। ৫০টি ঘর-বাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ হবে তিন লক্ষাধিক রিয়াল। সাংবাদিকদের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন স্থানীয় কবি আবদুল মজিদ গোলেস্তানী। তাঁর পরিবারের ৫ জন শহীদ হয়েছে যুদ্ধে গিয়ে। পাঁচ ছেলে এখনো লড়াই করছে বীর বিক্রমে। তাতেই তিনি শোক ভুলে জেহাদের জোশে এখনো উদ্বুদ্ধ।

www.pathagar.com

রকেট হামলায় দেজফুল জামে মসজিদও ধূলিসাৎ হয়েছে। চার হাজার লোক অধ্যুষিত এই শহরে শহীদ হয়েছে প্রায় ৪০ জন। আমাদের মধ্যে বয়সে যারা তরুণ সেই সাংবাদিকরা যার মধ্যে ছিল বাংলাদেশের সেলিম সামাদ ও তুরস্কের শেরিফ, দেজফুল নদীর মনোরম দৃশ্য দেখে পানির কাছে নেমে গেলো ঢাল বেয়ে। ডাচ এক সাংবাদিক জামা খুলে পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি। দেজফুল সেতু পেছনে রেখে আমাদের কয়েকজনের ছবি তুললো থাইল্যান্ডের নীতি হাসান।

ধ্বংসস্তূপ দেখে দেখে যুদ্ধের বিভীষিকায় মন যখন বিষন্ন কাতর হয়ে উঠেছিলো সেই মুহূর্তে দেজফুল নদীর পাড়ভাংগা কূলে দাঁড়িয়ে হিমশীতল বাতাসে মন জুড়িয়ে গেলো।

আমার মনে হলো, এইজন্যে এবং এই পরিবেশে যুদ্ধের দামামার পাশাপাশি প্রকৃতির নির্মল আবহাওয়ায় গ্রামের নিভৃত গুঞ্জনেই ইরানের মানুষের চোখে-মুখে দিচ্ছে প্রত্যয়ের দীপ্তি।

খবরের কাগজে চাকরী। টেবিলে বসে সারা দুনিয়ার খবর পাওয়া যায়। যুদ্ধ, হত্যা, দুর্ঘটনা, মৃত্যু—জীবনের এসব ট্রাজেডি কখনো মানুষকে বিমর্ষ আবার রাজনৈতিক কারণে উল্লসিত করে। আর আমরা পেশাদার সাংবাদিকরা দূর-দূরান্তের সেই সব মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার শরীক হই।

একাত্তুরে বাংলাদেশে মানুষের দুর্দশা দেখেছি। দেখেছি বুলেটবিদ্ধ, অগ্নিদগ্ধ লাশ পড়ে আছে রাস্তার ওপর। ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত, ভস্মীভূত। তার পাশে প্রাণ নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়নরত নারী-পুরুষ-শিশুর মিছিল দেখেছি। দুগ্ধপোষ্য সন্তান কোলে মেসিনগান ও মর্টারের গুলির ঝাঁকের মধ্যে দৌড়ে পালিয়ে আত্মরক্ষাও করতে হয়েছে।

কিন্তু ইরানের রকেট ও বোমা বিধ্বস্ত খুররম শহর অবদানের দৃশ্য ভিন্নতর। নিজের চোখে না দেখলে যুদ্ধের এই ধ্বংসলীলা দূর থেকে আন্দাজ করা দুঃসাধ্য। ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে আমি তাই ভাবছিলাম। যেন রোজ কেয়ামত হয়ে গেছে। দু'টি মুসলিম দেশের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের এই পরিণাম। দোষ দেবো কাকে? যে আঘাত হেনেছে, না যে হামলার শিকার হয়েছে। প্রথম কে আক্রমণ করেছে এবং কেইবা পশু প্রবৃত্তির এই প্রবণতাকে ধরে রাখতে চাইছে

www.pathagar.com

রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির প্রয়োজনে, তারও তো চুলচেরা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

ইরান-ইরাক যুদ্ধের প্রসঙ্গটি জাতিসংঘেও উঠেছিলো। ইসলামী সম্মেলন সংস্থার একটি বিশেষ কমিটি, যাতে বাংলাদেশ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে, সেই কমিটিও প্রচেষ্টা চালিয়েছিল ভ্রাতৃঘাতি এই যুদ্ধের অবসানের জন্যে।

গত দু'দিন ধরে ধ্বংসাবশেষ আর বিনাশের চিহ্ন দেখতে দেখতে মনটা বিষন্ন হয়ে উঠেছিল। বেহবাহানে একজন ইরানী আমাকে জিজ্ঞেস করলো, হাউ ডু ইউ ফিল। ক্লান্ত কণ্ঠে জবাব দিলাম—এক্সট্রিমলি সরি। রেডিওর একজন প্রতিনিধি হাতের মাউথপীস বাড়িয়ে বললেন, সে সামথিং। তাকে বললাম, ব্রাদার আই হ্যাভ লস্ট মাই ওয়ার্ডস। আমার সামনে তখন বিধ্বস্ত স্কুল ভবন। ব্ল্যাকবোর্ডে একটি অসমাপ্ত অংক। দেওয়ালে শিক্ষার্থীদের রক্তের দাগ। স্কুলের ছোট ছেলে মেয়েরা তো ফুলের মত নিষ্পাপ। তারা নিজের অজান্তেই শহীদ হলো ঘাতকের হাতে। তাজা উষ্ণ রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে গেছে ঘাতকের চোখে—এই দ্যাখো আমরা মরি নি, রক্তবীজ ছিটিয়ে দিলাম ফসলের ক্ষেতে। বেহবাহান স্কুল ভবনের দেয়াল থেকে রক্তের দাগ মোছে নি, আমার মন থেকেও। সেই বিষন্ন কাতরতা নিয়ে ১৩ই নভেম্বর আমরা খুররম শহরের দিকে রওয়ানা হলাম ভোর সাড়ে সাতটায়। আহওয়াজ থেকে দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার। ১০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতেই মহাসড়কের দু পাশে বিরাণ প্রান্তরে দেখতে পেলাম কয়েকটি বিধ্বস্ত ট্যাংক। দোভাষী বললেন: ইরাকী।

আরো কিছু দূর এগিয়ে হামিদ গ্যারিসন। একটা রেললাইন হাওইয়ের পাশ দিয়ে সমান্তরাল রেখায় গিয়ে মিশেছে। হামিদ গ্যারিসন ছিলো খুজিস্তান প্রদেশের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী গ্যারিসন। সেটি এখন সম্পূর্ণভাবে ধূলিসাৎ। আবার নতুন শেড নির্মাণ করা হয়েছে। শহরটি ইরাকী দখলে ছিলো সর্বমোট ৫৭৫ দিন। শহরের বাসিন্দা ছিলো ৩ লাখ ৬০ হাজার। এখন আছে আড়াই লাখ। যুদ্ধে এখনকার লোক মারা গেছে পাঁচ হাজার, জখম তারও অনেক বেশী। ক্ষয়ক্ষতির পরিমান আটশ' কোটি ডলারের মত।

পরে আমরা বিধ্বস্ত শহরটি ঘুরে ঘুরে দেখলাম। একজন সাংবাদিক

www.pathagar.com

সেই করুণ দৃশ্য দেখে ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন ঃ হামলার সময় তোমাদের সৈন্যরা কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিল ?

নিস্তেজ কণ্ঠে দোভাষীর জবাব, না। আমরা আদৌ প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি জানালেন, দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রথমে জনগণ প্রতিরোধ গড়ে তোলে। সৈনিক ও স্বেচ্ছাসেবীদের সহযোগিতায় প্রচন্ড পাল্টা হামলা চালিয়ে মাত্র চারদিনে শহরটিকে দখল মুক্ত করা হয়। খুররম শহর ঘুরে ঘুরে দেখার পর আমরা ইসলামী রক্ষী বাহিনীর অফিসে লাঞ্চ খেলাম। অফিসের প্রবেশ পথে সিমেন্ট বাধানো চত্তরে বিরাট করে মার্কিন পতাকা অংকিত রয়েছে। আমি ও সেলিম সামাদ সতর্ক পদক্ষেপে পতাকা এড়িয়ে ঢুকলাম ও বেরিয়ে এলাম। সেটা লক্ষ্য করে একজন জিজ্ঞেস করলো ঃ ঘুরে যাচ্ছো যে ? স্মিত হেসে বললাম, পতাকা আমেরিকার জনগণের, রিগান সরকারের নয়। আমার দেশের জাতীয় পতাকাকে শ্রদ্ধা জানাতেও শিখেছি। পরে জেনে নিলাম সেলিম সামাদকেও একই প্রশ্নের মোকাবিলা করতে হয়েছিলো।

ইসলামী গার্ড ভবনে আমাদের লাঞ্চের সাথে অতিরিক্ত একটা উপহার দেয়া হলো। সেটি হলে, ইসলামী বিপ্লবের ওপর নির্মিত রংগিন চলচ্চিত্র। ছবিটা বেশ ভালো লাগলো এবং সেই সংগে নিজেদের কথা ভেবে বেশ আহত হলাম মনে মনে। কি অবিমৃশ্যকারী জাতি এই বাংগালী। ন'মাসের মুক্তিযুদ্ধের ওপর এ ধরনের একটা ডকুমেন্টারী চলচ্চিত্র এখনো আমরা তৈরী করতে পারি নি। আমাদের যন্ত্র আছে, যান্ত্রিক আছে, আছে কুশলী, অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা। শুধু নেই ইতিহাসকে ধরে রাখার মানসিকতা। চারপাশে অগণিত বাংকার ও ট্রেঞ্চ। কয়েকটি রাডার কেন্দ্রও চোখে পড়লো। সেগুলোতে এখন ইরানের পতাকা উড়ছে। একটি বাংকারে এরই মধ্যে ঘাস গজিয়েছে, ফুল ফুটেছে বাতাসের দোলায় দুলছে ঘাস ফুল—ভংগীতে নবজীবনের ইংগিত।

ইরাকী বাহিনী দখল করে রেখেছিলো খুররম শহর। ১৮ মাস আগে এটি মুক্ত করা হয়েছে। গভর্নর মোহাম্মদ রেজা আব্বাসী আমাদের জানালেন, শহরের তিন চতুর্থাংশ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়েছে। এর একাংশ মেরামত খরচ হয়েছে ৩০ হাজার কোটি রিয়াল।

www.pathagar.com

খুররম শহর বিধ্বস্ত নগরী। এককালে এটি ছিল খুব ছিমছাম সুন্দর শহর। বিধ্বস্ত বাস-ভবনের আঙ্গিনায় এখনো আছে ফুলের বাগান। পত্রপুষ্প শোভিত। ধ্বংসের মধ্যে যেন জীবনের বিকাশ। গাছের ডালে পাখী ডাকলো। সাজানো বাগান, খেলার পুতুল, খাবার প্লেট, লিপস্টিক, ফীডিং বোতল ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে—মানুষ নেই। সে এক অবর্ণনীয় অনুভূতিতে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে।

দূরে তিনটে-চারটে পানির ট্যাংক বোমার ঘায়ে কাত হয়ে পড়ে আছে। টিভি এন্টেনা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে মানুষ নেই। আবাদানের লোকরা রসিক বটে। তারা ধ্বংসকে দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত করেছে এরই মধ্যে। অনেকগুলো বিধ্বস্ত অগ্নিদগ্ধ মোটর গাড়ী তারা খুঁটির সাথে লটকিয়ে রেখেছে, দেখে হাসি পেলো। আবাদানের বৃহত্তম তেল শোধনাগার দেখলাম বিধ্বস্ত ও পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ীর মত।

১৪ই নভেম্বর আমরা সুসান গার্দে গেলাম। কৃষিপ্রধান এলাকা। মাটি অত্যন্ত উর্বর। সোনা ফলে। আহওয়াজ থেকে দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার। ক্ষেতের আলে আলে ঝাউগাছ। বড় বড় কাঁচা নালা সেচ ব্যবস্থার মাধ্যম। শহরে কড়ই ও বাবলা জাতীয় গাছের প্রাচুর্য। এখানে ট্যাংক যুদ্ধের কিছু নমুনা দেখলাম। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বেশ কয়েকটা ট্যাংক বিধ্বস্ত অবস্থায় মাঠে-প্রান্তরে পড়ে রয়েছে। সুসান-গার্দ থেকে বুস্তান। সীমান্তের কাছাকাছি সাবলেহ ব্রীজের উপর গিয়ে থামলাম। পাশেই বিমান বিধ্বংসী ব্যাটারী। গোলন্দাজ সৈন্যরা আমাদের খোশ আমদেদ জানালো। তারপর তরমুজের ফালি ও লজেন্স দিয়ে আপ্যায়ন। দু'জন গোলন্দাজ আমার কাছে এগিয়ে এসে কি যেন জিজ্ঞেস করলো। না বুঝেই বললাম, বাংলাদেশ, মুসলমান, বেরাদর। আমরা করমর্দন ও আলিঙ্গন করলাম।

এখান থেকে স্পষ্ট কামানের গোলার শব্দ শুনতে পেলাম। আমরা রণাঙ্গনের আরো কাছাকাছি যেতে আগ্রহ প্রকাশ করায় দোভাষী আলী সাহেব ক্ষতিয়ারী জানালো—নো পারমিশন।

আমার সতীর্থ বাংলাদেশ টু'ডের সেলিম সামাদ বললো-নো প্রোব্লেম, উই গো ব্যাক।

পক্ষকালের ইরান সফরের অভিজ্ঞতা এবং স্থানীয় কিছু লোকের

www.pathagar.com

সাথে আলাপ-চারিতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়েছে ইসলামী বিপ্লবের শক্ত শিকড় গ্রামাঞ্চলে প্রোথিত। অবহেলিত শোষিত ও বঞ্চিত দেহাতী মানুষ মুক্তির স্বাদ পেয়েছে। রাষ্ট্রীয় কাজ-কর্মে অংশ গ্রহণের সুযোগ পেয়ে তারা কৃতার্থ ও আনন্দিত। গ্রামের উন্নয়নের সাথে সরাসরি জড়িত আছেন মসজিদের ইমাম অথবা মোল্লারা। এমনকি খোদ তেহরান শহরেও রেশনকার্ড বিলি-বণ্টনের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার মসজিদের ইমামের উপর। দুর্নীতি সমূলে উৎখাত হয়েছে, একথা জোর দিয়ে বলা না গেলেও দুর্নীতিকে শ্বাসরুদ্ধ করা হয়েছে।

তেহরানে একটা চাপাগুঞ্জন আছে, ইমাম খোমেনী অশীতিপর এবং অসুস্থ। ক্ষমতার দ্বন্দ্বে মজলিসের স্পীকার হুজ্জাতুল ইসলাম রাফসানজানি এবং ইমাম মুস্তাজারির মধ্যে লড়াই বাধার আশংকা রয়ে গেছে। তবে মোল্লাদের সমর্থের পাল্লা ভারি মুস্তাজারির দিকেই।

নিকট ভবিষ্যতের এই সমস্যা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে বৈপ্লবিক শক্তি সুসংহত হবে। সেই সঙ্গে উভয় পক্ষে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ জিইয়ে রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে একটা কল্যাণকর ভবিষ্যৎ ইরানীদের জন্যে অপেক্ষা করছে। তখন হয়তো ধর্মীয় উন্মাদনার বর্তমান প্রবাহ স্তিমিত হয়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচেষ্টা তীক্ষ্মধারা হবে এবং শেষ পর্যন্ত স্থিধী বিচার-বুদ্ধি ইসলামী বিপ্লবের পূর্ণাঙ্গ সাফল্য বয়ে আনতে পারে।

www.pathagar.com

ইসলামী ইরানে দশদিন

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

ইরানের ইসলামী বিপ্লব দুনিয়ার মানুষের কাছে এক মস্তবড় বিস্ময়। আমেরিকার ন্যায় একটি পরাশক্তির প্রত্যক্ষ মদদপুষ্ট একটি প্রবল পরাক্রমশালী রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটি নিরস্ত্র ও নিঃসহায় জনশক্তির এই সফল বিপ্লব দুনিয়ার বহু নামী দামী তাত্ত্বিক ও বিপ্লব কুশলীদেরও করেছে বিস্ময়ে হতবাক। দুনিয়াময় বিপ্লব ও পাল্টা-বিপ্লবী সংগঠনে যে সিআইএ ও কেজিবি'র এত নাম-ডাক, তারাও হার মেনেছে ইরানের এই সকল ইসলামী বিপ্লবের কাছে। এমন কি, সূচনা থেকে এই বিপ্লবের প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেও আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি নি এর অভূতপূর্ব সফলতা দেখে। কেননা রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমাদের সমস্ত ধ্যান-ধারণাকেই প্রবলভাবে নাড়া দিয়েছে এই বিপ্লবের গতিপ্রকৃতি। তাই বিপ্লবকে খুব নিকট থেকে দেখার এবং এর মর্মবাণীকে উপলব্ধি করার একটা প্রবল আকাংখা জেগেছিল অনেক দিন থেকেই। সৌভাগ্যক্রমে সে আকাংখা পূরণের একটা অপ্রত্যাশিত সুযোগও এসে গেল ইরানের সরকার নিয়ন্ত্রিত পার্স বার্তাসংস্থার সৌজন্যে।

১২ই মে ইরানের রাজধানী তেহরান মেহরাবাদ বিমান বন্দরে পেঁছিলাম। স্থানীয় সময় অনুসারে বেলা তখন তিনটা। বিমান বন্দরে আনুষ্ঠানিকতা সারার জন্যে আমরা এক দীর্ঘ কিউতে দাঁড়ালাম। অফিসার ও কর্মচারীরা দ্রুততার সাথে চেকিং করছেন। চোখে মুখে তাদের বিপ্লবের ছাপ। টার্মিনাল ভবনের ভেতরের ডেকোরেশনেও এর নমুনা লক্ষ্যণীয়। বড় বড় অক্ষরে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের অতি গুরুত্বপূর্ণ বাণীসমূহ উৎকীর্ণ করা হয়েছে ভবনটির দেয়ালে দেয়ালে। আমরা যে একটি ইসলামী শাসনতন্ত্রী রাষ্ট্রের পবিত্র ভূমিতে পা রেখেছি এসব ডেকোরেশনই তার অভ্রান্ত নিদর্শন। দেড় ঘন্টাকাল ধরে প্রায় সাত আট বার তারা আমাদের চেকিং করলেন। কিন্তু কলকাতার ন্যায় কেউ আমাদের কাছে হুইস্কির বোতল ও বিদেশী সিগারেট চাইলেন না; কিংবা বোম্বের ন্যায় কিছু ডলার প্রাপ্তির জন্যে কাউকে অনুনয় বিনয় করতেও দেখলাম না।

www.pathagar.com

টার্মিনাল ভবনের নির্গমন পথে এসে পেঁছতেই জানতে পারলাম পার্স বার্তা সংস্থার দুজন প্রতিনিধি দরজার মুখে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ মেহরাবাদ বিমান বন্দর থেকে আমরা শহর অভিমুখে যাত্রা করলাম। বিশাল বিস্তৃত জনবহুল শহর তেহরান। আধুনিক ধাঁচে নির্মিত অসংখ্য রাজপথ। সমগ্র রাজপথ জুড়েই যেন গাড়ীর এক অন্তহীন মিছিল। এই মিছিল ঠেলে ঠেলে প্রায় সাড়ে পাঁচটা নাগাদ আমরা পেঁছলাম মোসাদ্দেক এভিন্যুতে অবস্থিত হোটেল ভিক্টোরিয়ায়। আমরা পার্স প্রতিনিধিদের কাছে জানতে চাইলাম আমাদের প্রোগ্রামের বিষয়। তাঁরা জানালেন আজকের বিকেলটা সম্পূর্ণ বিশ্রামের। আগামীকাল থেকে প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজ।

উনিশশ' আটাত্তুর, ঊনআশির রক্তক্ষরা দিনগুলোতে ইরানের ইসলামী বিপ্লব প্রধানত রাজধানী তেহরানকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হলেও এর আসল প্রাণকেন্দ্র ছিল পবিত্র কোম নগরী। দক্ষিণ এশিয়ার ইসলামী জ্ঞানচর্চার এই শ্রেষ্ঠতম পাদপীঠে বসেই ইমাম আয়াতুল্লাহ্ রুহুল্লাহ্ মুসাভী খোমেনী এবং তাঁর সহযোগী আলেম সমাজ ইরানে রাজতান্ত্রিক জাহালিয়াতের অবসান এবং ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করছিলেন প্রায় চার যুগ ধরে। সংগ্রাম করছিলেন ইরানকে ইসলামী ঐতিহ্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে প্রাগৈতিহাসিক জাহেলিয়াত ও পাশ্চাত্য খোদাদ্রোহিতার পথে চালিত করার জন্যে যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছিলেন সে সবের বিরুদ্ধে।

কোম থেকেই তার বিরুদ্ধে উঠছিল সফল প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটেছিল ১৯৬৩ সালে। ইরানী সমাজের তথাকথিত আধুনিকায়নের নামে তখন স্বেচ্ছাচারী রেজাসাহেব যে সব অনৈসলামী ও অমানবিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে কোমের সমগ্র আলেম সমাজ তাকে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন দৃঢ়ভাবে। অনন্যোপায় রেজাশাহ আলেম সমাজের সেই বিক্ষোভ প্রতিবাদকে দমন করেছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে। সেদিন রাজপথে নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হাজার হাজার আলেমকে করা হয়েছিল হত্যা এবং তাদের অগ্রসেনা ইমাম খোমিনীকে পাঠানো হয়েছিল প্রথমে কারাগারে এবং তারপর নির্বাসনে। কিন্তু এত নিষ্ঠুরতা চালিয়েও স্বৈরাচারী রেজাশাহ নিভাতে পারেন নি বিপ্লবের আগুনকে, বরং

www.pathagar.com

সেদিনকার সেই চাপা দেয়া আগুনই ঊনিশশ' আটাত্তুর ঊনআশিতে এসে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল দাবানলরূপে। তাই ইরানের মাটিতে পা রাখার সাথে সাথেই আমাদের মনে পবিত্র কোম নগরী পরিদর্শনের আকাঙ্খা জেগে উঠল প্রবলভাবে।

১৪ই মে সকাল ন'টার দিকে আমরা তেহরান থেকে পার্স বার্তা সংস্থার একটি জীপে রওয়ানা করলাম পবিত্র কোম অভিমুখে। তেহরান থেকে সোজাসুজি দক্ষিণে প্রায় ১৪০ কিলোমিটার (কিঞ্চিদধিক ১০০ মাইল) দূরে অবস্থিত পবিত্র কোম নগরী। রাজধানীর সীমা ছাড়িয়ে অত্যন্ত দ্রুতবেগে ছুটে চলল আমাদের জীপ। প্রায় ১৪/১৫ কিলোমিটার অতিক্রমের পর রাস্তার ডান দিকে পড়ে রইল লাখো শহীদের শেষ শয়ণভূমি বেহেশত জাহ্রা। তারপর উঁচনীচু সর্পিল পথে আরো ৫০-৬০ কিলোমিটার অতিক্রমের পর বামদিকে পড়ল এক প্রকান্ড লবন হ্রদ। এই লবন হ্রদের সাথেও রয়েছে ইসলামী বিপ্লবের এক মর্মান্তিক অধ্যায় জড়িত। কথিত আছে, ১৯৭৩ সালে কোম নগরীর বিক্ষোভ দমনের জন্যে স্বৈরাচারী রেজাশাহ বহু আলেমকে হেলিকপ্টারে তুলে এনে নিক্ষেপ করেন এই বিশাল লবন হ্রদে। পরবর্তীকালে সেই হতভাগ্য আলেমদের কোন হাড্ডি কঙ্কালও খুঁজে পাওয়া যায়নি লবণ হ্রদের কোথাও। সম্ভবত তাঁদের হাড্ডিকঙ্কালগুলো একাকার হয়ে গেছে উত্তপ্ত লবণ পানিতে। আমরা জীপ থেকে নেমে লবণ হ্রদের অদূরে একটি গাছের নিচে কিছুক্ষন দাঁড়ালাম। তারপর আবার যাত্রা করলাম কোম অভিমুখে।

বেশ ছিমছাম, পরিচ্ছন্ন শহর কোম। আয়তন ও জনসংখ্যা খুব বেশী কিছু নয়। কিন্তু পরিবেশটা খুবই মনোরম। এটা যে ইসলামী জ্ঞানচর্চার একটা গুরুত্বপূর্ণ পাদপীঠ এবং ইসলামী সমাজেরও এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, শহরে ঢুকেই তা বুঝতে পারলাম। শহরের পথে পথে আয়তুল্লাহ্, হবু আয়তুল্লাহ্ এবং আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত মহিলাদের আনাগোণা। ছোট ছোট মেয়েদের শরীর পর্যন্ত কালো চাদরে আবৃত। অশালীন বেশবাশ ও চলাচলের নামগন্ধ পর্যন্ত নেই কোথও।

আমরা বিভিন্ন রাস্তায় একটু চক্কর লাগিয়ে বেলা সাড়ে বারটা নাগাদ পেঁাছলাম শহরে দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত ইমাম আলী

www.pathagar.com

রেজার ভগ্নী হযরত মাসুমার ঐতিহাসিক মাজারে। কোম নগরীতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দর্শনীয় স্থান। মাজারের প্রধান তোরণের সামনে দাঁড়িয়ে মনে পড়ল ইরানী মুসলিমদের বিরুদ্ধে একটি অপ-প্রচারের কথা। আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি ইরানের মুসলমানরা রসুলে করীমকে (সঃ) খুব বেশী একটা গুরুত্ব দেয় না। তাদের কাছে হযরত আলীই নাকি সবকিছু। কথাটা যে ডাহা মিথ্যা ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত, তার প্রমাণ তোরণের শীর্ষে বিরাট অক্ষরে খচিত কালেমায়ে তওহীদ 'আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লহুর' পর কালেমা শাহাদাত 'আশহাদু আন্না মুহম্মাদার রাসুলুল্লাহ্'। প্রায় হাজার বছর ধরে এখানে বিরাজ এই মাজারটি এবং তোরণের উপর খচিত কালেমা শাহাদাত অথচ ইরানী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন-ইরানী মুসলমানদের মনকে বিষিয়ে তোলার জন্যে চালানো হচ্ছে কত সুক্ষ্ম প্রচারণা। আমরা মাজারের ভেতর দিকে প্রবেশ করে আরো তাজ্জব বনে গেলাম। বিশাল এলাকা জুড়ে মাজারটি অবস্থিত। কয়েকটি বিরাট এলাকায় বিভক্ত এর গোটা পরিধি। নানারূপ বৈচিত্র্যময় কারু-কাজ খচিত এর বিশলায়তন দেয়ালগুলো। মূল মাজারটি জিয়ারত করতে ভীড় করেছে হাজার হাজার মানুষ। আমরাও ভীড় ঠেলে জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠ শেষে পেঁছিলাম মাজারের উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত মাদ্রাসায়ে ফয়জিয়ায়।

মাদ্রাসায়ে ফয়জিয়া আমাদের প্রচলিত অর্থে নিছক কোন ধর্ম শিক্ষা কেন্দ্র নয়। এটি কোমের বহুসংখ্যক উচ্চতর ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও গুরুত্বপূর্ণ ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। বর্তমান ইসলামী ইরানের স্থপতি ইমাম খোমেনী ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত ছিলেন এই মাদ্রাসার সঙ্গে জড়িত। এর শিক্ষাসুচী ও শিক্ষা পদ্ধতি একটি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তুলনীয়। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূল দর্শন বিভিন্ন মাজহাবের তুলনামূলক অধ্যয়ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ভাষাসমূহ এবং বিভিন্ন মত-বাদের তুলনামূলক অধ্যয়ন পর্যন্ত সব কিছুই শিক্ষাদানের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে এখানে। এটি সরকারী সাহায্য ও প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন ও আত্মনির্ভরশীল ইসলামী শিক্ষাকেন্দ্র। দেশ-বিদেশের হাজার হাজার শিক্ষার্থী প্রতি বছর উচ্চতর ইসলামী শিক্ষা লাভ করছে এই মাদ্রাসায়। আজকের ইরানের বহু আয়াতুল্লাহ্ ও বিশিষ্ট আলেম

www.pathagar.com

এখান থেকেই ইসলামের শিক্ষা ও দীক্ষা পেয়েছেন ইমাম খোমেনীর কাছে। এখানে তৈরী মর্দে মুজাহিদরাই বছরের পর বছর ধরে নিরলস-ভাবে কাজ করেছেন ইসলামী বিপ্লবের অগ্রসেনারূপে। ইমাম খোমেনী বর্তমানে এই মাদ্রাসার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন বটে; তবে ইসলামী নেতৃত্বের দিক থেকে ইরানের দু'নম্বর ব্যক্তিত্ব আয়াতুল্লাহ্ হোসেন আলী মুন্তাজারী এবং বিশিষ্ট ইসলামী শিক্ষাবিদ আয়াতুল্লাহ হাসান আলী মিশকীন রয়েছেন এর শিক্ষা ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত।

আমরা মাদ্রাসায় জোহরের নামায সেরে এর শিক্ষাসূচী ও শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষকদের সাথে কিছুক্ষণ আলাপ করলাম। তারপর দুপুরের আহার সেরে গেলাম মাজার থেকে পশ্চিম দিকে প্রায় আধ মাইল দূরে অবস্থিত ইমাম খোমেনীর বাসভবন দেখতে। প্রধান সড়ক থেকে ভেতরে একটি সংকীর্ণ গলির উপর একতলা একটি ছোট্ট বাড়ী। দেয়াল দরজা মামুলী, জানালা কাঁচ ভাঙা। এই হলো আজকের ইরানের অবিসম্বাদিত নেতা ইমাম খোমেনীর বাসভবন। আমরা বাড়ীর সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বেলা আড়াইটার দিকে ফিরতি যাত্রা করলাম তেহরান অভিমুখে।

প্রায় আশি মাইল দীর্ঘ চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বিকেল সোয়া চার-টায় আমরা ফিরে এলাম জাতীয় গোরস্থান বেহেশতে জাহ্‌রায়। পড়ন্ত বিকেলের নিরুত্তাপ রোদে তখন চিকচিক করছিল গোরস্থানের সবুজ-শ্যামল গাছ-গাছালি। আমরা গোরস্থানের প্রধান তোরণে পেঁছি-তেই দেখি দর্শনার্থীদের প্রচন্ড ভীড়। হাজার হাজার নর-নারী প্রবেশ করছে গোরস্থানের ভেতরে। কেউ যাচ্ছে প্রিয়জনের কবর জিয়ারত করে মনের বেদনাভার হাল্কা করতে, আবার কেউ যাচ্ছে শহীদানের কবর জিয়ারত থেকে শাহাদাতের প্রেরণা নিতে। আমরা ভীড় ঠেলে ধীর-পদ-বিক্ষেপে এগিয়ে চললাম গোরস্থানের অভ্যন্তরভাগে। প্রায় আধ ঘন্টা পথ চলার পর আমরা পেঁছিলাম গোরস্থানের নতুন এলাকায়। এই এলাকায়ই শুয়ে আছেন ইসলামী বিপ্লবের হাজার হাজার বীর শহী-দান। নিপুণ শিল্পীর মত অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাজান হয়েছে প্রতিটি কবরের সারি। প্রতিটি সারিতে রয়েছে হাজার হাজার কবর। যতদূর দৃষ্টি যায়, চোখে পড়ে শুধু কবর কবর আর কবর। বাস্তবিকই সে এক অনিবর্চনীয় দৃশ্য। স্বৈরাচারী রেজাশাহকে উৎখাত করে ইসলামী

www.pathagar.com

বিপ্লব সংঘটনের জন্যে ইরানের অকুতোভয় মুসলমানরা কি চরম মূল্য দিয়েছে, এ কবরগুলোই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বেহেশ্‌তে জাহরায় প্রতিদিনই দর্শনার্থীদের প্রচন্ড ভীড় জমে। তবে এদিন ভীড়টা একটু বেশীই হয়েছিল। এর একটি বিশেষ কারণ ছিল। ইরানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের কুর্দিস্তানে বিদ্রোহাত্মক তৎপরতা চালানোর সময় সোভিয়েত ও ইরাকী মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী কুর্দিরা প্রায় শ'তিনেক ইসলামী রক্ষী ও সরকার অনুগত বিশিষ্ট ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গিয়ে দোলেতুহ নামক স্থানে গোপনে আটক করে রেখেছিল। এরপর সরকারী বাহিনীর মারমুখো অভিযানের মুখে বিদ্রোহী কুর্দিরা পালিয়ে গেলে ইরাকী যুদ্ধ বিমান এসে ঐ গোপন কারাগারের উপর বোমা বর্ষণ করে এবং তাতে প্রায় দু'শ ইসলামী রক্ষী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রাণ হারান। এই নারকীয় ঘটনা প্রকাশ হয়ে পড়ায় সমগ্র ইরানে প্রচন্ড ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ইরানী জনগণ ঐ দিনটিকে শোক-দিবসরূপে পালন করে। বেহেশতে জাহরায়ও এদিন ভীড় জমেছিল ঐ কারণে। এদিন শহীদানের কবর জিয়ারত করতে শুধু তাদের প্রিয়জনরাই আসেনি, তাদের সাথে এসেছিল হাজার হাজার সংগ্রামী নরনারী ও তরুণ-তরুণী। কয়েকশত শিশু কিশোরও এসেছিল সামরিক কায়দার উর্দি পরে মিছিল সহকারে। তাদের চোখে-মুখে ছিল একই স্বপ্নের অভিব্যক্তিঃ আমরা লড়াই করে শহীদ হবো, কিন্তু অন্যায়ের কাছে নতি স্বীকার করবো না। দর্শনার্থী-দের এক বিরাট অংশ ভীড় করে দাঁড়িয়েছিল সাধারণ সারি থেকে পৃথক একটা বিশেষ কবরের পাশে। এই কবরটি হলো ইমাম খোমেনীর ঘনিষ্ট সহকর্মী ইসলামী ইরানের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং বিপ্লবী পরিষদের প্রথম চেয়ারম্যান আয়াতুল্লাহ মাহমুদ তালেকানীর। শত শত নর-নারী ও তরুণ-তরুণী কবরের পার্শ্বে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে ফাতেহা পাঠ করছিল নিবিষ্টচিত্তে। আমরা কয়েকবার উদ্যোগ নিয়েও কবরের কাছে ঘেঁষতে ব্যর্থ হলাম। দর্শনার্থীরা কিছুতেই কবরের পাশ থেকে সরতে চাইছিল না। ডঃ তালেকানী যে ইরানী জনগণের হৃদয়ের কত গভীরে স্থান করে নিয়েছিলে, দর্শনার্থীদের এই ভক্তি-শ্রদ্ধা থেকে তাই প্রতিভাত হয়ে উঠছিল।

পশ্চিম আকাশে সূর্য দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল। গোরস্থানে মানুষের

www.pathagar.com

চলও ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিল। নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সবাই আসছিল বন্যার তোড়ের মত। পথ চলাচলের সুবিধাও ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। আমরা শহীদানের সারিবদ্ধ কবরের এক প্রান্তে গিয়ে ফাতেহা পাঠ করলাম। সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছ'টা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম তেহরানে।

ইসলামী তেহরানে অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় জিনিস হলো তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত জুমার নামাযের জামাত। তেহরান নগরীতে ৭০/৮০ লাখ মানুষ বাস করলেও এখানে বিশালায়তন কোন কেন্দ্রীয় মসজিদ বা ময়দান নেই বড় আকারের জামাত অনুষ্ঠানের জন্যে। তাই ইসলামী বিপ্লবের পর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে নির্বাচন করা হয় জুমার জামাত অনুষ্ঠানের জন্যে। এটি রাজধানীর কেন্দ্রীয় বা প্রধান জামাত। লক্ষ লক্ষ লোক শরীক হয় এই গুরুত্বপূর্ণ জামাতে। ১৫ই জুন শুক্রবার বেলা এগারোটায় পার্স বার্তাসংস্থার প্রতিনিধিদের সাথে আমরা চললাম বিশ্ববিদ্যালয় অভিমুখে। কিছুদূর এগোতেই দেখি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। চারদিক থেকে লাখ লাখ নর-নারী ছুটে আসছে জামাতে যোগদানের জন্যে। সবাই যাচ্ছে সামনের দিকে। তারপর যে যেখানে জায়গা পাচ্ছে, বসে পড়ছে। দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশের সমস্ত এলাকা লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। অন্তত চার-পাঁচ মাইল এলাকার মধ্যে যত রাস্তাঘাট ছিল, তা সবই জামাতে পরিণত হয়ে গেল। এ এক অচিন্তনীয় ব্যাপার।

আমরা পার্স বার্তাসংস্থার মেহমান হিসেবে ভীড় ঠেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ভবনের সামনে এগিয়ে গেলাম এবং জামাতের একেবারে পুরোভাগে গিয়ে জায়গা নিলাম। মেয়েরা গিয়ে আসন নিলেন উঁচু পর্দা দিয়ে ঘেরা তাদের নির্দিষ্ট এলাকায়। আমাদের সামনেই একতলা দালানের সমান উচু একটি সুসজ্জিত মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছোট ছোট শিশুরা কোরাসের সুরে একটি উদ্দীপনার গজল গাইছিল। উপস্থিত লাখ লাখ মানুষ তাদের সে গজল শুনে বারবার স্লোগানে ফেটে পড়ছিল। বেলা বারোটা নাগাদ পার্লামেন্ট ও মন্ত্রীসভার কতিপয় সদস্য সমভিব্যাহারে প্রধানমন্ত্রী মুহাম্মদ আলী রাজাই এসে আসন নিলেন জামাতের পুরোভাগে। অত্যন্ত সাদাসিধা ও নিরহংকার মানুষ প্রধানমন্ত্রী রাজাই। চেহারা-সুরতও তাঁর রাশভারী কিছু নয়। কিন্তু

www.pathagar.com

ব্যক্তিত্বটা যে অসামান্য, তাঁর উপস্থিতির সাথে সাথেই সেটা টের পাওয়া গেল।

আমাদের মাথার উপর তখন আগুন-ঝরা রোদ। প্রচন্ড উত্তাপ সত্ত্বেও গোটা জামাতের উপর একবিন্দু, ছায়াদানের ব্যবস্থা ছিলনা কোথাও। কিন্তু মুসল্লীদের সেদিকে ভ্রুক্ষেপ ছিলনা এতটুকু। মাঝে মাঝে বিরাট আকারের স্প্রেয়ারের সাহায্যে তাদের উপর গোলাপ পানি ছিটিয়ে দেয়া হচ্ছিল বৃষ্টির মত। তাতে উত্তাপের কিছুমাত্র প্রশমন না হলেও সুগন্ধিতে মন-প্রাণ ভরে উঠছিল অপরিসীম আনন্দে। বারোটা দশ মিনিটে একটি তরুণ এসে দাঁড়াল মঞ্চের মাইকের কাছে। আমি ভাবছিলাম, সে হয়তো কোন জরুরী ঘোষণার জন্যে মাইকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হল। তরুণটি মাইকের কাছে দাঁড়িয়েই শুরু করল আজান দিতে। বলিষ্ঠ কণ্ঠের সে আজান শুনে আমি রীতিমত বিস্মিত ও চমৎকৃত হচ্ছিলাম। আজানের প্রতিটি বাক্যই যেন বিশাল তেহরান জুড়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। তরুণটি যখন আজানের তৃতীয় বাক্য আশহাদু-আন্না মুহাম্মদর রাসূলুল্লাহ্ উচ্চারণ করছিল, তখন উপস্থিত লাখ লাখ জনতার সোচ্চার দরুদে তেহরানের আকাশ-বাতাস যেন মুখরিত হয়ে উঠছিল। বাস্তবিকই সে এক অনির্বচনীয় দৃশ্য।

বেলা সোয়া বারোটায় মঞ্চে আবির্ভূত হলেন হুজ্জাতুল ইসলাম সাইয়েদ আলী খামেনী। দেশের সর্বোচ্চ প্রতীক্ষা পরিষদে ইমাম খোমেনীর প্রতিনিধি হালকা-পাতলা গড়নের এই হুজ্জাতুল ইসলাম ডান হাতে রাইফেলের উপর ভর দিয়ে মাইকের সামনে দাঁড়ালেন খুৎবা দিতে। আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসা ও রসূলের প্রতি দরুদ পাঠের মাধ্যমে তিনি শুরু করলেন তাঁর দীর্ঘ খুত্বা। ইসলামের সোনালী যুগের ন্যায় মুসলিম সমাজের সমকালীন সমস্যাবলীর প্রতি তিনি আলোকপাত করলেন এক এক করে। এছাড়া আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ)-র জন্ম দিবসকে সামনে রেখে তাঁর শিক্ষা আদর্শের প্রতিও তিনি আলোকপাত করলেন অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায়। জামাতে উপস্থিত মুসল্লীদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিলেন ফার্সী ভাষী আর কিছু ছিলেন আরবী ভাষী। তাই এক ঘন্টায় দীর্ঘ খুতবার মধ্যে তিনি পয়তাল্লিশ মিনিটই বক্তব্য রাখলেন ফার্সীতে। বাকী

www.pathagar.com

পনের মিনিটের খুত্‌বা দিলেন আরবীতে। এতে করে খুতবার মর্ম গ্রহণে মুসল্লীদের কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না, আমাদের দেশের ন্যায় খুত্‌বা শুনতে শুনতে কাউকে ঝিমাতেও দেখা গেল না। খুত্‌বার "আসসুলতানু জিল্লুল্লাহি ফিল্ আরদ" (রাজা-বাদশাহ্ দুনিয়ার আল্লাহ্‌র ছায়া স্বরূপ) ধরণের মিথ্যা কথাও কাউকে শুনতে হলে না।

সোয়া একটায় ইমাম সাহেব মঞ্চ থেকে নেমে এসে দাঁড়ালেন জামাতের পুরোভাগে। যথারীতি নামায আদায় হলো। এরপর হঠাৎ শুরু হয়ে গেল তুলকালাম কান্ড। মঞ্চ থেকে ঘোষণার সাথে সাথেই চারদিক থেকে লোকেরা ছুটে আসতে লাগল যুদ্ধ তহবিলে সাহায্য জমা দেয়ার জন্যে। নগদ টাকা, খাবার জিনিস যে যা পারল তাই নিয়ে এসে জমা দিতে লাগল। ছোট ছোট স্কুলগামী ছেলেরা এলো টিফিনের পয়সা জমানোর অর্থের বিরাট বিরাট তোড়া নিয়ে। পর্দার আড়াল থেকে মেয়েরা পাঠাতে লাগল নগদ টাকা ছাড়াও তাদের অতিপ্রিয় সোনার অলংকারাদি। দেখতে দেখতে সাহায্যের এক বিরাট স্তুপ গড়ে উঠল। এদিকে মঞ্চ থেকে যুদ্ধে অংশ গ্রহণে ইচ্ছুক যুবকদের প্রতি নাম তালিকাভুক্ত করারও আহ্বান জানান হচ্ছিল। সে আহ্বানে সাড়া দিয়ে উৎসাহী যুবকরা নাম তালিকাভুক্তির জন্যে দীর্ঘ কিউতে এসে দাঁড়াচ্ছিল। লাখো শহীদের রক্তে-গড়া ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে হিংস্র হায়েনার কবল থেকে রক্ষা করার জন্যে ইরানী জনগণের যে কি দুর্জয় সংকল্প, এসব ঘটনা ছিল তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমরা অবাক চোখে এসব দেখতে দেখতে ফিরে এলাম হোটেল ভিক্টোরিয়ায়।

উত্তর তেহরানের যে এলাকায় আমরা অবস্থান করছিলাম সেটি ছিল শাহী আমলের সুবিধাভোগীদের এলাকা। ঢাকার গুলিস্তান, শাহবাগ কিংবা ধানমন্ডি-গুলশানের সাথে এ এলাকাটির মিল রয়েছে বহুলাংশে। কায়েমী স্বার্থ, ধ্বসে পড়ার ভয়ে এই এলাকার বহুলোক ইসলামী বিপ্লবের সাথে সহযোগিতা করে নি, বিপ্লবের সাফল্যের পরও তাদের অনেকে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে নি। তাই তাদের মধ্যে এখনো পুরনো জীবনধারা আচার-আচরণ বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়। এই এলাকার বামপন্থী ও মার্কসবাদীদের কিছু নড়াচড়াও চোখে পড়ে। প্রত্যেক রাস্তার মোড়ে

www.pathagar.com

মোড়ে ও ফুটপাতে তাদের বইপত্রের অনেক পসরা বসে। তবে তেহরানের বিপুল জনসংখ্যার দৃষ্টিতে এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। সাধারণ তেহরানবাসী বিপ্লবের সময়ও এদের তোয়াক্কা করে নি, আজো তেমন কোন প্রতিবন্ধক বলে ভাবে না; বরং এদের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করেই তারা বিপ্লবকে সফলকাম করেছে, এখনো বিপ্লবের ধারাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। তাই বিপ্লবের এই সৈনিকদের জীবনধারা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের জন্যে বিকেলের দিকে আরো চললাম দক্ষিণ তেহরান অভিমুখে।

কর্মব্যস্ত মধ্য-তেহরান অতিক্রম করে প্রায় আধঘণ্টা সামনে এগুনোর পর আমরা পৌঁছলাম দক্ষিণ তেহরানে। এলাকাটি সত্যি দেখার মত। প্রোজ্জ্বল উত্তর তেহরানের সাথে নিষ্প্রভ এই দক্ষিণ তেহরানের যেন কোন মিল নেই। এই এলাকার বাড়ী-ঘর অতি সাধারণ, অধিবাসীদের জীবন-যাত্রাও নেহাত মামুলি। শাহী আমলে এত চাকচিক্য ও জাঁক-জমকের কোন ছাপই পড়েনি এদের জীবনে। আলো ঝলমল উত্তর তেহরানের পাশে এই এলাকাটি যেন সম্পূর্ণ বেমানান। অবশ্য এই এলাকার আসল চিত্রটা আমরা দেখার সুযোগ পাই নি। বিপ্লবের পূর্বে এই এলাকার অনেক জায়গাতেই আলো-পানির ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা পর্যন্ত ছিল না। রাস্তা-ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর ব্যবস্থাও ছিল নামকা ওয়াস্তে। কিন্তু বিপ্লবের পর আলো পানির ব্যবস্থা চালু হয়েছে। রাস্তা-ঘাট ও পয়ঃপ্রণালীর অবস্থাও বহুলাংশে উন্নতি লাভ করেছে। তবু এখনো বহু কাজ বাকী। বর্তমান সরকার অস্বাস্থ্যকর ও অনুপযুক্ত বাড়ী-ঘর ভেঙ্গে নতুন বাড়ী-ঘর তৈরী করছেন। জীবন-যাত্রার অন্যান্য দিককেও উত্তর তেহরানের সমমানে নিয়ে আসার চেষ্টা চলছে। এসব কর্মোদ্যোগের কিছু কিছু নমুনাও আমাদের চোখে পড়ল।

প্রায় আধ ঘণ্টাকাল দক্ষিণ তেহরানে চক্কর লাগিয়ে আমরা আবার ফিরলাম উত্তরের দিকে। পথিমধ্যে শহীদ মুরতাজা মুতাহারী ধর্মতাত্ত্বিক কলেজে আসরের নামায পড়ে মন্ত্রীদের অফিস পাড়ার ভেতর দিয়ে এবং বিশালায়তন ন্যাশনাল পার্ক ও হোটেল হিলটনের পাশ ঘেঁষে আমরা সোজা এগিয়ে গেলাম তেহরানের প্রান্তদেশে অবস্থিত রেজা শাহের পরিত্যক্ত নিরাভরণ ও সাদাবাদ প্রাসাদের কাছে। রাজধানী তেহরানে রেজাশাহের প্রাসাদ ছিল চারটিঃ গুলিস্তাঁর,

www.pathagar.com

মর্মর, সাদাবাদ ও নিরাভরন। এর মধ্যে প্রথম দু'টি পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এবং শেষ দুটি নিজের পছন্দ অনুযায়ী নির্মিত। তবে রেজাশাহ সাধারণত নিজের নির্মিত প্রাসাদ দুটিতেই বসবাস করতেন। এর মধ্যে আবার নিরাভরণই ছিল সবচেয়ে বেশী অগ্রগণ্য। এই প্রাসাদেই তাঁর বিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন অবস্থিত। আমরা যখন প্রাসাদের কাছে পেঁাছি, তখন পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত-প্রায়। তাই প্রাসাদের অভ্যন্তরভাগ দেখার সময় না থাকায় আমরা চলে এলাম হোটেলে।

রেজাশাহের প্রাসাদগুলো সাধারণ অর্থে কতগুলো বাসভবনই নয়, বরং এগুলোকে বিলাস বহুল উপশহর বলে আখ্যায়িত করাই অধিকতর সঙ্গত। প্রাসাদগুলোর আয়তন কম-বেশী ৪/৫ বর্গমাইল থেকে ৮/১৩ বর্গমাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। নিরাভরণ প্রাসাদটি আয়তনে দ্বিতীয় পর্যায়ের হলেও ময়ূর সিংহাসনের অবস্থানের দরুণ এর গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী। অবশ্য এই গুরুত্বের সাথে ইরানের সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না। কেননা তাদের কাছে শাহী প্রাসাদ ছিল 'নিষিদ্ধ এলাকা'। প্রাসাদের সীমানা থেকে কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে তাদের কোন প্রবেশাধিকার ছিল না। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নীতির ফলে ইরানের জনগণ রেজাশাহের চেহারা-সুরত পর্যন্ত কোন দিন দেখতে পায় নি। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে এক 'রূপকথার নায়ক'। সাধারণ মানুষ তাঁকে দেখতে পেত বড়জোর টেলিভিশন কিংবা সিনেমার পর্দায়।

ইসলামী বিপ্লবের পর এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে অকল্পিতভাবে। বিপ্লবের প্রচন্ড জোয়ারে শুধু রেজাশাহের তখতে-তাউসই ভেসে যায়নি, তাঁর প্রাসাদগুলোর দরজাও খুলে গেছে সাধারণ মানুষের জন্যে। তারা এককালের এই নিষিদ্ধ এলাকাগুলোর ভেতরে ঢুকছে এবং 'রূপকথার নায়কে'র কীর্তিকান্ড দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছে। বিশেষত নিরাভরণ প্রাসাদের ভেতরে তারা যেসব দৃশ্য দেখেছে, তা কল্পনাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, রেজা-শাহ এই প্রাসাদের অতিথি ভবনটি পর্যন্ত সাজিয়েছেন অজস্র পর্ণোগ্রাফী ও অশ্লীল মূর্তির সাহায্যে। আর প্রমোদ-ভবন ও শয়ন-কক্ষের যে সাজ-সজ্জা, তাঁর বর্ণনা দেয়ার মত রুচিশীল ভাষা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। সম্ভবত এসব কারণেই শাহী প্রাসাদগুলোকে

www.pathagar.com

যাদুঘর বলে ঘোষণা করা সত্ত্বেও নিরাভরণ প্রাসাদে জনসাধারণের যাতায়াত বন্ধ রাখা হয়েছে। তাই আমাদেরকেও নায়াভরণ প্রাসাদ দেখার বাসনা ত্যাগ করতে হলো।

- ১৬ই মে সকাল ন'টার দিকে আমরা পার্সের একটি জীপ নিয়ে ছুটলাম সা'দাবাদ প্রাসাদ অভিমুখে। প্রায় এক ঘন্টা চলার পর আমরা পেঁছিলাম দক্ষিণ তেহরান থেকে প্রায় দেড় হাজার ফুট উচ্চে অবস্থিত সা'দাবাদ প্রাসাদের প্রধান তোরণে। পার্সের গাড়ীটি বহির্দরজার বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখে আমরা প্রবেশ করলাম বিশালায়তন অভ্যর্থনা ভবনে। আমাদের সহযাত্রী পার্স প্রতিনিধি প্রয়োজনীয় অনুমতিপত্র সংগ্রহ করার পর আমরা প্রাসাদের নিজস্ব গাড়ীতে চাপলাম ভেতরে প্রবেশের জন্যে। প্রকান্ড অন্তদর্রজা পেরিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চললাম উত্তর দিকে—ঢালু থেকে ক্রমশ উঁচু স্তরে।

পথের দুদিকে নানা মূল্যবান গাছ-গাছালির বিপুল সমারোহ। মাঝে মাঝে বর্ণাঢ্য ফুলের ঝোপ-ঝাড় ও কৃত্রিম ফোয়ারার সাথে ক্ষুদ্রায়তন পানির হ্রদ। সমগ্র এলাকাটি যেন একটি বিশালায়তন বাগান বাড়ী। উত্তর মুখে কিছুদূর যাবার পর আমাদের সামনে পড়ল প্রকান্ড একটি সাদা বাড়ী। মর্মর পাথরের তৈরী এ বাড়ীর সামনে দন্ডায়মান একটি ব্রোঞ্জ মূর্তির হাটুসমেত নীচের খন্ডিত অংশ। তার পার্শ্বেই একটি বোর্ডে লেখা রয়েছে—"মোঝে ভাগুত" অর্থাৎ "শয়তানী শক্তির যাদুঘর।" আমাদের সহযাত্রী গাইডকে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম, এই বিশাল বাড়ীটি ছিলো রেজাশাহের একান্ত বাসভবন। সাদাবাদে এলে তিনি এই বাড়ীতে বসবাস করতেন শাহবানু ও তাদের শিশু সন্তানসহ। বাড়ীর সামনে যে ব্রোঞ্জ মূর্তির খন্ডিত অংশ রয়েছে সেটা ছিল রেজাশাহের নিজের মূর্তি। কথিত আছে যে, এখানে কোন অভ্যাগত এলে তাকে প্রথমেই নতশির হয়ে অভিবাদন জানাতে হত মূর্তিটিকে। বিপ্লবের পর কর্তৃপক্ষ মূর্তির উপরিভাগ ভেঙ্গে ফেলে শুধু হাটুসমেত নীচের ভাগ রেখে দিয়েছেন ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসেবে। তবে নিরাভরণ প্রাসাদের ন্যায় এই বাড়ীটিও সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত নয়। সম্ভবত এর মধ্যেও লুকিয়ে রয়েছে নিরাভরণ প্রাসাদের মতই অনেক রহস্যের কুব্জটিকা।

এরপর আঁকা-বাঁকা আরো কিছু পথ অতিক্রম করে আমাদের গাড়ী

www.pathagar.com

গিয়ে থামল উত্তর প্রান্তে অবস্থিত একটি সুন্দর সুদৃশ্য বাড়ীর সামনে। এবাড়ীটিও আগাগোড়া সাদা মর্মর পাথরের তৈরী। দরজায় নক করতেই গাইড বেরিয়ে এসে আমাদের নিয়ে গেল ভেতরে। অনেকগুলো প্রশস্ত ও সুসজ্জিত কক্ষ দোতলা এই প্রকান্ড বাড়ীটিতে। গাইড থেকে জানা গেল, রেজাশাহের আহার-বিহার ও অফিসরূপে ব্যবহৃত হত এর কয়েকটি কক্ষ। বাকী কক্ষগুলো নির্দিষ্ট থাকত বিদেশী মেহমানদের ব্যবহারের জন্যে। প্রতিটি কক্ষের মেঝেতে মূল্যবান গালিচা, তার উপর নেপোলিয়ান যুগের আসবাবপত্র, দেয়ালে দেয়ালে বর্ণাঢ্য কারু-কাজ, মাথার উপর সুদৃশ্য ঝাড়বাতি ও প্রমোদ-কক্ষে বাদ্যযন্ত্রের সমারোহ দেখে গোটা পরিবেশটাকে মনে হচ্ছিল এক বিরাট স্বপ্নপুরী।

প্রায় দেড় ঘন্টকাল বাড়ীর ভেতরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখার পর আমরা বেরিয়ে এলাম সদলবলে। ফিরতি পথে ডানে ও বাঁয়ে চোখে পড়ল আরো কতগুলো সুন্দর ও সুদৃশ্য বাড়ী। প্রতিটি বাড়ীই মূল্যবান মর্মর পাথরের তৈরী। একটি বাড়ী রেজাশাহের ভাইয়ের, একটি তাঁর বোনের এবং অন্যগুলো তাঁর ছেলেমেয়েদের। প্রতিটি বাড়ীই স্বতন্ত্র পরিবেশ ও পরিমন্ডলে তৈরী। আবার সবগুলো বাড়ীই একটি বৃহত্তর পরিবেশ পরিমন্ডলে অবস্থিত। যার সাথে তেহরান নগরী কিংবা তার কোন বাড়ী-ঘরের কোন সাদৃশ্য নেই।

ইরান গত সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইরাকের সাথে এক মারাত্মক রক্ত-ক্ষয়ী যুদ্ধে লিপ্ত। এই যুদ্ধ সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে এক মস্তবড় উদ্বেগের বিষয়। কিন্তু তাজ্জবের বিষয় এই যে, রাজধানী তেহরানের জীবন-যাত্রা দেখে এই যুদ্ধের বিষয়ে আঁচ করা যায় না কিছুই। শুধু রেডিও-টেলিভিশন খুললে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় চোখ বুলালে যুদ্ধের হালচাল টের পাওয়া যায় কিছুটা। এই কারণ প্রধানত দুটি। প্রথমত—তেহরান অত্যন্ত জনবহুল ও কর্মব্যস্ত নগরী; দ্বিতীয়ত—রাজধানী থেকে রণাঙ্গন অনেক দূরে অবস্থিত। তবু এটা অনস্বীকার্য যে, তেহরানের জনচিত্তেও যুদ্ধের প্রভাব রয়েছে জীবন্ত। তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত জুমার জামাতে এর কিছুটা প্রমাণ পেয়েছি আমরা। এ ব্যাপারে আরো কিছুটা অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে আমরা রণাঙ্গনে (কিংবা তার কাছাকাছি এলাকায়) যাওয়ার

www.pathagar.com

আগ্রহ প্রকাশ করেছিলাম তেহরানে উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই। পার্স কর্তৃপক্ষও এ ব্যাপারে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করার আশ্বাস দিয়েছিলেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটা আর সম্ভবপর হয়নি সম্ভবত আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সর্বোচ্চ প্রতিরক্ষা পরিষদ থেকে নিশ্চয়তা না পাওয়ার কারণে। তাছাড়া আমরা তেহরানে পৌঁছার পর ইরাকী গোলার আঘাতে একজন বিদেশী সাংবাদিকের মৃত্যুর খবর শুনে আমাদেরও রণাঙ্গন পরিদর্শনের আগ্রহ উবে গিয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই।

তবু এ যুদ্ধের সাথে ইরানী জনগণের একাত্মতার দিকটি পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন ছিল আমাদের। এ ব্যাপারে পার্স কর্তৃপক্ষ কিছু কর্মসূচী তৈরী করে রেখেছিলেন পূর্বাহ্নেই। সে অনুসারে ১৬ই মে সকাল ন'টায় আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো যুদ্ধের রসদ সংগ্রহে লিপ্ত "জিহাদ সাজ জিন্দেগী'র (জাতীয় পুনর্গঠন সংগ্রাম) চারটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে। তেহরান—১৫, মসজিদে মাহদী, মেহরাবাদ ময়দানে, আজাদী প্রভৃতি অঞ্চলে এই কেন্দ্রগুলো অবস্থিত। আমরা এই কেন্দ্রগুলোতে নিয়োজিত লোকদের কর্মতৎপরতা এবং যুদ্ধের জন্যে সংগৃহীত রসদের বিপুল সম্ভার দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। আমাদের উপস্থিতির সময় পর্যন্ত এক একটি কেন্দ্রের উদ্যোগে বাংলাদেশী মুদ্রার হিসেবে গড়পরতা ৮০/৯০ লাখ করে টাকা, আড়াই সের করে সোনা (কিংবা তার অলংকার) এবং ৩০/৪০ টন করে অন্যান্য মালামাল সংগৃহীত এবং রণাঙ্গনে প্রেরিত হয়েছিল। এইসব মালামালের মধ্যে খাবার জিনিস, তৈজসপত্র, কাপড়-চোপড়, বৈদ্যুতিক পাখা, ওষুধপত্র ইত্যাদি সব কিছুই শামিল ছিল। আমরা যখন এইসব কেন্দ্র পরিদর্শন করছিলাম, তখন তাদের বিশালায়তন কক্ষগুলো পরিপূর্ণ ছিল বিচিত্র সব মালামালে।

এই কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনে গিয়ে আমরা চমৎকৃত হলাম সেখানে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী মেয়েদের কারিগরি নৈপুণ্য দেখে। প্রতিটি কেন্দ্রে গড়পরতার প্রায় ১০০ থেকে ১৫০ জন মেয়ে নিয়মিত কাজ করেন যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে। আপাদমস্তক কালো চাদরে আবৃত এই মেয়েরা বাড়ী থেকে নিজ নিজ সেলাই মেশিন নিয়ে আসে প্রত্যহ সকালে এবং সৈনিকদের জন্যে দিনভর পোশাক তৈরীর কাজ সেরে আবার বাড়ী ফিরে যান সন্ধ্যায়। এজন্যে কোন পরিশ্রমিক নেন

www.pathagar.com

না তাঁরা। আমরা যখন কেন্দ্রগুলোতে উপস্থিত হলাম, তারা সালাম সহ আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে খোশ-আমদেদ জানালেন আমাদের। তাঁদের উৎসাহ-উদ্দীপনা ও কাজের প্রতি নিষ্ঠা দেখে মনে হচ্ছিল, তাঁরা যেন দুশমনদের কবল থেকে ইসলামী প্রজাতন্ত্রকে রক্ষার জন্যে ঠিক ফ্রন্টে বসেই যুদ্ধ করছেন। আমরা প্রায় চার ঘণ্টা ধরে কেন্দগুলো পরিদর্শন করে বেলা একটায় ফিরে এলাম হোটেলে।

একদিন বিকেলে হযরত আলী (রাঃ)-এর ঐতিহাসিক রচনা-সম্ভার (চিঠিপত্র ও রাষ্ট্রীয় নির্দেশাবলীর সংকলন) "নাহ্জুল বালাগাহ"র হাজার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে শহীদ ডক্টর মুরতজা মুতাহারী কলেজে শুরু হয়েছিল সপ্তাহব্যাপী এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। নাহ্জুল বালাগাহ সম্পর্কে বক্তব্য রাখার জন্যে এই সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন দেশ-বিদেশের অনেক জ্ঞানী-গুণী ও সুপন্ডিত ব্যক্তি। দিনভর প্রচুর ছুটাছুটি সত্ত্বেও এই অনন্য সম্মেলনে উপস্থিত হবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না আমরা। তাই কাহরিজাক হাসপাতাল থেকে ফেরার পথে কিছুক্ষণের জন্যে ঢু মারলাম সম্মেলন স্থলে। সুসজ্জিত বিশাল প্যান্ডেলের নীচে তখন হাজার হাজার মুগ্ধ শ্রোতা উপবিষ্ট। নাহ্জুল বালাগাহ সম্পর্কে পন্ডিত ব্যক্তিদের মূল্যবান ভাষ্য শুনছেন তাঁরা মন্ত্রমুগ্ধের মত। মাঝে মাঝে তাঁরা সাড়া দিচ্ছেন সোচ্চার আওয়াজে।

ইরানে অবস্থানকালে ইমাম খোমেনীর সাথে সাক্ষাতকার ছিল আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় আকাঙ্খিত বিষয়। যে ক্ষণজন্মা পুরুষ প্রায় অর্ধ-শতক ধরে নিরলস সংগ্রাম করে তিন হাজার বছরের পুরোনো একটি রাজতন্ত্রকে উৎখাত করে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন। যিনি দেড় হাজার বছর পর ইসলামী জীবন আদর্শকে একটি বিপ্লবী চেতনায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ইরানের বীর জনগণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই পরাশক্তি এবং তাদের দালালের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আপোষহীনভাবে লড়ছেন, তাঁর সাথে সাক্ষাতকারের আকাঙ্খাটা অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য বৈকি।

আমরা এ আকাঙ্খার কথা আমাদের মেজবান পার্স কর্তৃপক্ষের কাছেও ব্যক্ত করেছিলাম নিঃসংকোচে। তাঁরাও এ সাক্ষাতকারের জন্যে সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করবেন বলে আমাদের আশ্বাস দিয়েছিলেন। কিন্তু

www.pathagar.com

আমাদেরই পরম দুর্ভাগ্য যে ইরানে আমাদের উপস্থিতির ক'দিন আগে থেকেই ইমাম খোমেনী ছিলেন গুরুতরভাবে অসুস্থ। চিকিৎসকরা দুসপ্তাহের জন্যে তাঁর সাথে সব রকম দেখা-সাক্ষাত করে দিয়েছিলেন নিষিদ্ধ। ইরানে আমাদের অবস্থানকালেও সে নিষেধাজ্ঞা ছিল পুরো-দস্তুর বলবৎ। তাই ইমামের সাথে দেখা-সাক্ষাতের আকাংখাও ধীরে ধীরে চেপে যেতে হলো আমাদেরকে। তবু এ ব্যাপারে একটা ব্যর্থ উদ্যোগ নিলেন আমাদের মেজবান পার্স কর্তৃপক্ষ।

১৮ই মে সোমবার ছিল হযরত আলী (রাঃ) এর জন্মদিন। এদিন সমগ্র ইরানে ছিল জাতীয় ছুটি। পার্স কর্তৃপক্ষ বললেন এদিন ইমাম খোমেনী কিছুক্ষণের জন্যে জনগণের সামনে আসবেন। সুতরাং আমরা সেখানে উপস্থিত থাকলে তাঁর সাথে আমাদের সাক্ষাতকারের আশা মোটামুটি ছেড়েই দিয়েছিলাম। তবু মেজবানদের কথায় আবার কিছুটা আশান্বিত হলাম। সে অনুসারে সোমবার (১৮ই মে) সকাল আটটায় পার্সের একটি জীপে চেপে আমরা উত্তর তেহরানের জার্মান মহল্লায় অবস্থিত ইমামের বর্তমান বাসস্থান পানে ছুটলাম। আমরা জার্মানের কাছাকাছি পৌঁছেই দেখি, তুলকালাম কান্ড। ইমামের বাসস্থান অভিমুখে লোক ছুটছে বন্যার তুড়ের মত। নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ, তরুণ-তরুণী সবাই ছুটছে রুদ্ধশ্বাসে। অবস্থা বেগতিক দেখে আমরা জীপ থেকে নেমে পড়লাম। আমাদের সহযাত্রী পার্স প্রতিনিধিরা একটু ঘুরে এসে জানালেন: ইমামের বাসস্থান প্রায় আধমাইল রাস্তা জুড়ে লোকে লোকারণ্য। সামনের দিকে আর এক কদমও এগোবার যো নেই।

ইমামের বাসস্থান অভিমুখে গণ-মানুষের এই অভিযাত্রা ছিল একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। হযরত আলী (রাঃ)-এর জন্মদিন উপলক্ষে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষিত হলেও একদিন ইমামের বাসস্থানে কোন—বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল না। এর মধ্যে পীরের বাড়ীতে মুরীদের হাজিরা দেয়ার মত কোন দুর্জ্ঞেয় কারণও নিহিত ছিল না। তবু হাজার হাজার মানুষ রুদ্ধশ্বাসে ছুটছিল ইমামের বাসস্থান অভিমুখে। এই স্মরণীয় দিনে ইমামকে এক নজর দেখা এবং তাঁর দু'চারটি কথা শোনার জন্যে তারা উদগ্রীব চিত্তে ছুটছিল দলে দলে পায়ে হেঁটে

www.pathagar.com

মাইলের পর মাইল পথ পেরিয়ে। আধুনিক ইরানী জনগণের চিত্তে ইমাম খোমেনীর আসন যে কত পাকাপোক্ত, তাদের এই অভিযাত্রা ছিল এরই অত্যুজ্জল দৃষ্টান্ত। আমরা উপায়ন্তর না দেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলাম ভীড় কমবার আশায়। মনে মনে ভাবলাম, সামনের লোকেরা সরে এলে হয়ত সুযোগ আসবে আমাদের। কিন্তু আধঘণ্টা অতিক্রমের পরও ভীড় কমবার লক্ষণ দেখা গেল না এতটুকু, বরং সময় যত যাচ্ছিল ভীড় ততই বাড়ছিল। আমরা ভীড় ঠেলে সামনে এগোবার চেষ্ঠা করেও ব্যর্থ হলাম কয়েকবার। এই পরিস্থিতিতে ইমামের সাথে সাক্ষাতের আর কোন সম্ভাবনা না দেখে আমরা ফিরে এলাম ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

বেলা ন'টার দিকে আমরা গেলাম জামশেরিয়া কারাগারে ইরাকী যুদ্ধবন্দীদের পরিদর্শন করতে। ফাতেমী এভেন্যুতে অবস্থিত এই কারাগারটির পরিবেশ অনেকটা সৌখিন জমিদারের বাগান বাড়ীর মত। বিশাল এলাকা জুড়ে হালকা পাতলা গাছ-গাছালি এবং তার ফাঁকে ফাঁকে বাড়ীঘর। আমাদেরকে প্রধান ফটকে অভ্যর্থনা জানালেন কারাগারের কর্মকর্তা এবং তাঁর সহকর্মীবৃন্দ। মিনিট পাঁচেক পায়ে হেঁটে সামনে এগোবার পর আমরা পেঁছিলাম একতলা একটি বাড়ীতে। দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই খোলামেলা এক বিরাট হলঘর। এই হল ঘরেই একত্রে বসবাস করছে ইরাকী যুদ্ধবন্দীদের একটি দল। আমাদের উপস্থিতি টের পেয়েই একসঙ্গে ছুটে এল বেশ কিছু বন্দী। বেশ হাসিখুশী চেহারা তাদের। যেন প্রিয়জনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে তারা। সামনে এসেই তারা সোৎসাহে সালাম জানাল আমাদের। আমরা আরবী ও ইংরেজীতে কুশল জিজ্ঞেস করলাম তাদের। তারা খুব স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে জানাল, বেশ আরামেই দিন কাটছে তাদের। আহার বিশ্রাম ইত্যাদি ব্যাপারে কোন অসুবিধা বোধ করছে না তারা। কোনরূপ দুর্ব্যবহারও করা হয় না তাদের সাথে। আমরা একে একে ৭০/৮০ জন বন্দীর সাথে কথা বললাম ঘুরে ঘুরে। তাদেরকে প্রশ্ন করলাম, ইরানের ন্যায় একটি ইসলামী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কেন যুদ্ধ করতে এসেছিল তারা? তারা কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করেই বলল: তারা স্বেচ্ছায় যুদ্ধ করতে আসে নি, ইরাকের বাথপন্থী সমাজতন্ত্রী শাসকরা যুদ্ধফ্রন্টে ঠেলে দিয়েছিল তাদেরকে। আমরা

www.pathagar.com

কৌতূহলভরে আরেকটি প্রশ্ন করলাম তাদের ঃ আহার, বিশ্রাম ছাড়া বাকী সময়টা কিভাবে কাটছে তাদের? তারা অসংকোচে বলল ঃ নামায আদায়, কুরআন তিলওয়াত ও ইসলামী পুস্তকাদী পড়ে সময় কাটছে তাদের।

আমরা হলঘর থেকে বেরিয়ে আসার পথে কারা-কর্তৃপক্ষকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ যুদ্ধবন্দীরা সাধারণত কারণে-অকারণে বিদ্রোহ ঘোষণা করে কিংবা পালানোর চেষ্টা করে থাকে? আটকাবস্থা থেকে। ইরাকী বন্দীরা কি এরকম কোন চেষ্টা করেছিল? তাঁরা বললেন ঃ না, এখানে তেমন কোন ঘটনা ঘটেনি। বন্দীরা মোটামুটি শান্তশিষ্টই রয়েছে। আলাপের শেষ পর্যায়ে কারা-কর্তৃপক্ষ আমাদের লক্ষ্য করে বললেন ঃ আপনারা আমাদের এখানে ইরাকী বন্দীদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করলেন। এরপর ইরাকে গিয়ে আপনারা দেখুন, ইরানী বন্দীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে। তারপর আপনারা দেশে ফিরে গিয়ে উভয় দেশে বন্দীদের সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে লিখুন। তাহলেই বিশ্ববাসী প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে। আমরা কারা-কর্তৃপক্ষের পরিচ্ছন্ন বিবেক ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের কথা ভাবতে ভাবতে বেরিয়ে এলাম কারাগারের বিরাট-লৌহ-কপাট-পেরিয়ে।

শাহের আমলে ইরানে সাক্ষী-গোপাল স্বরূপ একটি পার্লামেন্টের অস্তিত্ব ছিল যাকে বলা হত জাতীয় মজলিস। জাতীয় স্বার্থের বিনিময়ে শাহের ব্যক্তিগত স্বার্থরক্ষা করাই ছিল এই তথাকথিত জাতীয় মজলিসের একমাত্র কর্তব্য। বিপ্লবের পর গত বছরের শুরুতে অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে উক্ত পার্লামেন্টের স্থলে একটি নতুন পার্লামেন্ট অস্তিত্ব লাভ করেছে, ইরানের নয়া সংবিধানে যার নাম দেওয়া হয়েছে 'মজলিসে শুরায়ে ইসলামী'। অবশ্য সংক্ষেপে এই নতুন পার্লামেন্টকেও বলা হয় মজলিস। আজকের ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানে এই নবগঠিত মজলিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক ব্যাপক। দেশের সরকার গঠন, আইন প্রণয়ন, জাতীয় স্বার্থসংরক্ষণ, সামাজিক পুনর্গঠন ইত্যাকার সকল মৌলিক কাজের দায়িত্বই মজলিসের উপর ন্যস্ত। এদিক থেকে বলতে গেলে মজলিসই আধুনিক ইসলামী ইরানে সর্বোচ্চ দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান। ২৭০ টি আসন বিশিষ্ট এই মজলিসে বর্তমানে ইসলামী জাতীয়তবাদী

www.pathagar.com

ও সংখ্যালঘুসহ সকল দল ও মতেরই রয়েছে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব। এর মধ্যে এককভাবে আইআরপি'র সংখ্যাশক্তি প্রায় সোয়া দুইশ।' ছোটখাট অন্যান্য ইসলামী দলগুলোর দখলে রয়েছে আরো ১০/১২টি আসন। এ ছাড়া সংখ্যালঘু খৃস্টানদের ২টি এবং জোরাস্ট্রিয়ান ও ইহুদীদের রয়েছে ১টি করে আসন। বাকীআসনগুলো জাতীয়তাবাদী এবং অন্যান্যদের। মজলিসের এই অনন্য গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের কারণেই এর কার্যধারা অবলোকন ছিল আমাদের কাছে এক বিরাট আকর্ষণের বস্তু। পার্স কর্তৃপক্ষও সেজন্যে দিন-ক্ষণ স্থির করে রেখেছিলেন যথাসময়ে।

১৯শে মে সকালে ন'টায় আমরা পার্সের দুজন প্রতিনিধি সমভিব্যহারে গেলাম মজলিস ভবনে। অধিবেশন শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা গিয়ে আসন নিলাম সুসজ্জিত দর্শক গ্যালারিতে। সময় তখন সকাল সাড়ে ন'টা। অধিবেশন কক্ষের দিকে তাকাতেই তার আসনবিন্যাস দেখে অবাক হয়ে গেলাম আমরা। স্পীকার সাধারণ সদস্যদের মুখোমুখি অপেক্ষাকৃত উচু একটি পৃথক সারিতে উপবেশন করেছেন। একই সারিতে তাঁর ডান ও বায়ে বসে রয়েছেন মজলিসের সেক্রেটারী এবং সিনিয়র কর্মকর্তা। সম্পূর্ণ পৃথক সারিতে তাঁর জন্যে কোন একক আসন রাখা হয় নি অধিবেশন কক্ষে। আমাদের জন্যে এ ছিল এক নতুন অভিজ্ঞতা। এ অভিজ্ঞার পর আরো কিছু নতুন অভিজ্ঞতা অর্জিত হলো মলজিসের কার্যক্রমের ব্যাপারে। অধিবেশন কক্ষের আসন বিন্যাসের ন্যায় সেটাও ছিল একটা ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। সে প্রসঙ্গে আসছি একটু পরে।

আমরা যখন দর্শক গ্যালারিতে প্রবেশ করছিলাম তখন অধিবেশন কক্ষে সদস্যদের উপস্থিতি ছিল দু'শয়ের কাছাকাছি। মাঝে মধ্যে দু একজন সদস্য কার্যব্যপদেশ কক্ষের বাইরে চলে যাচ্ছিলেন আবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছিলেন। কিন্তু অধিবেশন কক্ষে কখন কজন সদস্য উপস্থিত ছিলেন কিংবা কজন সদস্য বাহিরে যাচ্ছিলেন আর কজনই বা ফিরে আসছিলেন, তা জানতে অসুবিধা হচ্ছিল না মোটেই। কেননা এটা জানার সুবিধার্থে স্পীকারের ডান ও বাঁয়ে রয়েছে দুটি এবং তাঁর দৃষ্টি বরাবর সদস্যদের পেছন দিকে রয়েছে একটি স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক্সের পর্দা। অধিবেশন চলাকালে এই তিনটি পর্দায়ই বরাবার ভেসে উঠেছিল কক্ষে উপস্থিত সদস্যদের মোট সংখ্যাশক্তি। উপস্থিত

www.pathagar.com

সদস্য সংখ্যার মত ভোটাভুটির সময়ও পক্ষ ও বিপক্ষের সদস্য-সংখ্যা ভেসে উঠে এই স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক্সের পর্দায়। এই ব্যবস্থার কারণে সংখ্যাশক্তি জানার জন্যে এখানে মাথা গুণতির প্রয়োজন হয় না মোটেই।

দর্শক গ্যালারিতে আমরা যখন আসন নিচ্ছিলাম স্পীকার জনাব আলী আকবর হাশেমী রাফসানজানী তখন দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছিলেন সদস্যদের উদ্দেশ্যে। তাঁর এই বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল মজলিসে উত্থাপিত একটি প্রস্তাব। এখানকার নিয়ম অনুযায়ী মজলিসে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে হলে উত্থাপককে তা লিখিতভাবে পাঠাতে হয় মজলিসের সেক্রেটারী কাছে। সেক্রেটারী তাঁর আসন থেকে দাঁড়িয়ে তা পড়ে শোনান সদস্যদেরকে। তারপর স্পীকার আলোচনা সূত্রপাত করার জন্যে কিছু প্রাথমিক বক্তব্য রাখেন প্রস্তাবটি সম্পর্কে। তার-পরই সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন আলোচনায়। সর্বশেষে ভোটাভুটির পর তা পড়ে শোনান সদস্যদেরকে। তারপর স্পীকার আলোচনার সূত্রপাত মাধ্যমে নির্ণীত হয় প্রস্তাবটির ভাগ্য। আমাদের কাছে এই গোটা প্রক্রিয়াটিই ছিল অভিনব। আর স্পীকারকে এভাবে দাঁড়িয়ে বক্তব্য করতে দেখাটা ছিল রীতিমত চমকপ্রদ।

প্রায় দুই ঘন্টাকাল অধিবেশনের কার্যধারা চলার পর বেলা সাড়ে এগারোটায় মজলিসের অধিবেশন মুলতবী ঘোষণা করা হলো কিছুক্ষণের জন্যে। এই ফাঁকে আমরা দর্শন গ্যালারী থেকে বেরিয়ে এলাম বাইরের প্রশস্ত বারান্দায়। একই গ্যালারী থেকে আমাদের পিছু পিছু বেরিয়ে এলেন ঐতিহ্যবাহী পাগড়ী ও জোব্বা পরিহিত এক তরুণ 'আয়াতুল্লাহ্'। প্রথম সম্বোধনেই ভদ্রলোক চমকে দিলেন আমাদেরকে। অত্যন্ত চমৎকার ইংরেজীতে তিনি জানতে চাইলেন, কোন্ দেশ থেকে এসেছি আমরা। কিছুক্ষণ তাঁর চোখমুখের দিকে তাকিয়ে থেকে ইংরেজীতেই জবাব দিলাম তাঁর নানা প্রশ্নের। অত্যন্ত গতিশীল ও প্রাগ্রসর চিন্তার অধিকারী এই তরুণ আয়াতুল্লাহ্। ইংরেজী ছাড়াও আরবী, জার্মান, ফ্রান্স ও উর্দু ভাষায় দক্ষতা রয়েছে তাঁর। বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও কম নয়। তাঁর প্রতিটি কথাই ছিল শাণিত তরবারির মত। তাঁর মতে, আমেরিকা ও রাশিয়া 'সুপার পাওয়ার' নয়, এরা হলো 'সুপার ক্রিমিনাল'। তাঁর সাথে আলাপ সেরে বারোটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে এলাম মজলিস ভবন থেকে।

ইরানের অর্থনীতি সম্পর্কে এদ্দিন কিছু বলার সুযোগ হয়নি। শাহী আমলে ইরানে অর্থনীতি বলতে তেমন কিছু ছিল না।

www.pathagar.com

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও সুবিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও রেজাশাহ কিম্বা তার পিতা রেজাখান দেশটিকে কোন অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলেন নি। রেজাশাহ দৈনিক লক্ষ লক্ষ ব্যারেল তেল উত্তোলন করে আমেরিকা ও ইসরাইলকে সরবরাহ করেছেন, পাইপ লাইন বসিয়ে কোটি কোটি ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিয়েছেন। আর এ থেকে প্রাপ্ত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে তিনি পাশ্চাত্য জগত থেকে খাবার জিনিস, বিলাস দ্রব্য ও সামরিক সরঞ্জাম কিনেছেন। পিতা-পুত্র তাদের দীর্ঘ ষাট বছরের শাসনকালে দেশে কোন মৌল শিল্প স্থাপন করেন নি, দেশের কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার বা আধুনিকায়নের কোন উদ্যোগ নেন নি। অবশ্য রেজাশাহ মাঝারি ধরনের দু'একটি শিল্প কারখানা স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তার জন্যেও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কাঁচা মাল ইত্যাদি আনতে হয়েছে পাশ্চাত্য জগত, বিশেষত ইরানী তেলের প্রধান গ্রাহক আমেরিকা থেকে। কৃষি ব্যবস্থার সংস্কার ও আধুনিকায়নের নামে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে রেজাশাহ 'শ্বেত বিপ্লবে'র একটা ধুয়া তুলেছিলেন। বহির্বিশ্বেও এ নিয়ে অনেক ঢাকঢোল পিটান হয়েছিল।

কিন্তু সেই তথাকথিত শ্বেত বিপ্লবের মাধ্যমে ইরানের সমগ্র উর্বর ভূমিকে তুলে দেয়া হয়েছিল শাহী পরিবার-পরিজন আত্মীয়-স্বজন এবং উচ্চ পদস্থ সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের হাতে; প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে কোন জমি বন্টন করা হয় নি। এর ফলে গত কয়েক যুগে কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষত খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইরান শুধু পরিবর্তনশীলই থেকেছে। দেশের সাড়ে তিন কোটি লোকের জন্যে খাদ্যের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগই তাকে আমদানী করতে হয়েছে বিদেশ থেকে।

খাদ্য আমদানীর পর রেজাশাহ তেল রফতানী থেকে অর্জিত বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার এক বিরাট অংশ ব্যয় করেছেন অত্যাধুনিক সামরিক সরঞ্জাম ক্রয়ের খাতে। আমেরিকার প্ররোচনায় রেজাশাহ ইরানকে বানাতে চেয়েছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার শ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিরূপে। এ কারণে দেশের কৃষি শিল্পে উন্নতির পরিবর্তে তিনি শুধু আমেরিকা থেকে সমরাস্ত্র কিনেছেন নিবিষ্ট চিত্তে। এতে করে ইরানী জনগণের কোন কল্যাণ সাধিত না হলেও আমেরিকার ফায়দা হয়েছে দু'দিক থেকেই। একদিকে সে ইরানের তেল সম্পদ লুণ্ঠন করে-

www.pathagar.com

অন্যদিকে তার উৎপন্ন সমরাস্ত্র বিক্রি করতে পেরেছিল ইরানের কাছে। অবশ্য এর বিরুদ্ধে ইরানী জনগণের মধ্যে যাতে বিক্ষোভ দানা বাধতে না পারে সে জন্যে তিনি দেশের যুব সমাজ বিশেষত শহুরে অধিবাসী-দের ঠেলে দিচ্ছিলেন পাশ্চাত্যমার্কা ভোগ-বিলাসের আবর্তে। আধু-নিকতার নামে প্রতি বছর তিনি শত শত কোটি ডলার ব্যয়ে পাশ্চাত্য থেকে হাজার হাজার টন বিলাস-দ্রব্য আমদানী করেন এ উদ্দেশ্যেই। তেল থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার একটি বিরাট অংশ এভাবে তিনি ফেরত পাঠিয়ে দেন পাশ্চাত্যের বাজারে।

বিপ্লবের পর শাহের এই আত্মঘাতী নীতির কুফলই প্রকট হয়ে উঠেছে ইরানী জনগণের কাছে। ঘটনা প্রবাহের অনিবার্যতায় আমেরিকার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ায় শাহ অর্থনীতির দেওলিয়া-পনাটা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে সবার কাছে। তাঁর চোখ ঝলসানো জাঁকজমক শহুরে জীবনের ঠাক-ঠমক শত শত কোটি ডলার মূল্যের সামরিক সরঞ্জাম—ইত্যাদি সবকিছুই ধ্বসে পড়েছে একটা মস্তবড় বালুর বাঁধের মত। এর পরিণতিতে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির ঘাটতি, বিলাস-দ্রব্যের উচ্চমূল্য ও মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়েছে খুব স্বাভাবিকভাবে। এর উপর আবার চেপে বসেছে ইরাকের আগ্রাসন। বিপ্লবের প্রাথমিক ধকল কাটিয়ে উঠে যে মুহূর্তে সরকার অর্থ-নৈতিক পুনর্গঠনের কাজে হাত দেবেন ঠিক তখনই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে এই আগ্রাসনকে। আগ্রাসনের ফলে তেলের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এবং খাদ্য-শস্য ও অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সাধারণ বাজার থেকে চড়াদামে কিনতে হওয়ায় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধগতি আরো কিছুটা বেড়ে গেছে। তবু সরকার দ্রব্যমূল্য নামক পাগলা ঘোড়ার লাগামটা শক্ত হাতে ধরে রেখেছেন। বাজারে মুদ্রা সরবরাহ অব্যাহত রেখে এবং সাধারণ কর্মচারী ও শ্রমিকদের মাহিনা বৃদ্ধি করে দৃঢ়ভাবে সংকটের মুকাবিলা করা হয়েছে। তার ফলে এত ঝড়-ঝাপটা সত্ত্বেও বিপ্লব পরবর্তী গত আড়াই বছরে ইরানে কোন দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখা দেয়নি।

অবশ্য বিপ্লবের পর থেকে এ পর্যন্ত ইরানের ইসলামী সরকার শুধু আত্মরক্ষার কাজই করেননি তাঁরা গঠনমূলক কাজেও অনেকখানি এগিয়ে গেছেন। তাঁরা দেশের কৃষি ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছেন এবং প্রকৃত কৃষকদের মধ্যে জমি বণ্টন ও কৃষি

www.pathagar.com

উৎপাদন বৃদ্ধিতে তাদের আর্থিক সহায়তা দানের এক বিরাট কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। বীজ, সার এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহের জন্যে কৃষকদেরকে বিনাসুদে কোটি কোটি টাকার ঋণদান করা হয়েছে। এর সুফলও ইতিমধ্যে দেখা গেছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ফলে দেশের খাদ্য ঘাটতি হ্রাস পেতে শুরু করেছে। বিপ্লবের পূর্বে যেখানে বিদেশ থেকে খাদ্য আদানীর পরিমাণ ছিল চাহিদার শতকরা ৭৫ ভাগ, সেখানে তা কমে গিয়ে বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে শতকরা ২৫ ভাগে। এই বিরাট সাফল্যের কারণেই এত প্রতিকূলতার মধ্যেও ইরানী জনগণকে প্রয়োজনীয় খাদ্য সরবরাহ করতে সরকারকে খুব বেশী বেগ পেতে হচ্ছে না।

শিল্পায়নের ক্ষেত্রে ইরানের বিপ্লবী সরকার অত্যন্ত বাস্তবধর্মী নীতি গ্রহণ করেছেন। সাবেক সরকার যে নগণ্য সংখ্যক শিল্প কারখানা স্থাপন করেছেন বিদেশ নির্ভরতার দরুণ তার অধিকাংশকেই চালু রাখা বর্তমানে সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে বর্তমান সরকার সম্পূর্ণ দেশজ কৃষিপণ্যের উপর নির্ভরশীল শিল্প-কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছেন। এ ধরণের মাঝারি ও ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু কিছু শিল্প-কারখানা ইতিমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। পেট্রোক্যামিক্যাল এবং যুদ্ধসরঞ্জাম তৈরীর কিছু কিছু কারখানা স্থাপনের দিকেও সরকার নজর দিয়েছেন এবং এ ব্যাপারে বেশ উৎসাহব্যঞ্জক সাফল্যও অর্জিত হয়েছে। অবশ্য সার্বিক জাতীয় চাহিদা পূরণের উপযোগী শিল্প-কারখানা স্থাপনে এখনো বেশ সময় লাগবে এবং সে সময়টা না আসা পর্যন্ত দ্রব্যমূল্যও কিছুটা ঊর্ধগতি থাকবে। এ একটি বাস্তব সত্য ; একে সরকারের ব্যর্থতা আখ্যা দেয়া কোনক্রমেই সমীচীন হবে না। বিপ্লবের পর অন্য কোন সরকার ক্ষমতায় এলেও এ রকম পরিস্থিতিরই উদ্ভব হত এবং একে পাশ কাটিয়ে কেউই যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় রাতা-রাতি দেশের অর্থনীতিকে উন্নত করতে পারতেন না।

বর্তমান সরকার জাতীয় জীবনের সার্বিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে "জিহাদ সাজ জিন্দেগী ; (জাতীয় পুনর্গঠনের জিহাদ) নামক একটি শক্তিশালী বিভাগ খুলেছে। এই বিভাগের মাধ্যমে সারা দেশেই জাতীয় পুনর্গঠনের এক ব্যাপক অভিযান চলেছে। এই অভিযানের ফলে বিপ্লবের পর থেকে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে শত শত মাইল

www.pathagar.com

রাস্তা অসংখ্য নতুন ও পুরাতন-রীজ এবং হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা ও স্কুল নির্মিত হয়েছে। যুদ্ধের ডামাডোলের দরুণ বহির্বিশ্বে এই নির্মাণ অভিযানের খুব একটা প্রচার না হলেও এর ফলে বিপ্লবোত্তর ইরানের চেহারা বহুলাংশে পাল্টে গেছে। শাহী আমলের সুবিধা-ভোগী এবং ইসলামী বিপ্লবের নিন্দুকরা যতই হতাশাব্যঞ্জক কথা বলুক না কেন, ইরানের নির্যাতিত মানুষ এ থেকে বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছে। এ কারণে ইরাকী আগ্রাসনসহ দেশী-বিদেশী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তারা সরকারের পিছনে অবিচল পাহাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। কাজেই যদি জনগণের কল্যাণের মাপকাঠিতে কোন বিপ্লবের সার্থকতা বিচার করতে হয়, তা হলে ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে অবশ্যই সফলতম বিপ্লব আখ্যা দিতে হবে।

ইসলামী বিপ্লবের পর ইরানে ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে এসেছে এক বিরাট অর্থবহ পরিবর্তন। শাহী আমলের ইরানের খবর যারা রাখেন, তাঁরা জানেন যে, ইরানী মুসলমানদের জীবন থেকে ইসলামের প্রভাব মুছে ফেলার জন্যে দীর্ঘকাল ধরে একটা সজ্ঞান প্রয়াস চলেছে। ইরানী মুসলমানদেরকে আধুনিক' ও প্রগতিশীল বানানোর লক্ষ্যে রেজাশাহ দেশের শহরগুলোতে ব্যাপকভাবে ছবি-ঘর, নৈশক্লাব, পানশালা-নাচঘর ও ম্যাসেজ পার্লার চালু করেন। তিনি রাজধানী তেহরানকে গড়ে তোলেন সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য ধাঁচে। প্রায় ৭০/৮০ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই বিশাল নগরীর বাইরের চেহারায় পাশ্চাত্যের সব বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ত, কিন্তু ইসলামের কোন বিশেষত্ব সাধারণত দৃষ্টিগোচর হত না। রেজাশাহ ইরানের মুসলিম নারী সমাজকে আধুনিক বানানোর লক্ষ্যে তাদের জন্যে বোরখা পরা নিষিদ্ধ এবং স্কার্ট পরা বাধ্যতামূলক করেন। এমনকি তিনি প্রগতির নামে এতদূর অগ্রসর হন যে, নৈশক্লাব, পানশালা নাচঘর, সেলুন ও ম্যাসেজ পার্লারগুলোতে পুরুষ খদ্দেরদের জন্যে মহিলা কর্মচারী রাখার নিয়ম চালু করেন। তার এই প্রগতির ঠেলায় ইরানের শহর বন্দরগুলোতে বিরাট বিরাট বেশ্যালয় ও পর্ণোগ্রাফির বিপণি গড়ে উঠে। ইরানের মুসলিম যুব সমাজ তাঁর এই প্রগতির সমুদ্রে পড়ে হাবুডুবু খেতে থাকে।

জাতিগতভাবেও রেজাশাহ ইরানীদের মুসলিম চেতনা ভুলিয়ে দেয়ার চেষ্টা করেন নানাভাবে।। তাঁর বাবা রেজা খান প্রথমে একজন

www.pathagar.com

সাধারণ কৃষকের সন্তান হিসাবে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন এবং পরে চক্রান্তের মাধ্যমে দেশের শাসনক্ষমতা দখল করে ইরানী জাতির পাহলবী ধারার উত্তরাধিকারী আখ্যা দিয়ে আর্যমেহের উপাধি ধারণ করেন। দেশের জনগণের মধ্যেও তিনি মুসলমানীত্বের পরিবর্তে আর্যত্ব জাগিয়ে তোলার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালান। শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমগুলোকেও তিনি আর্যত্ব প্রচারের জন্যে উৎসাহ যোগান। এর পরে তিনি নিজেকে আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার রাজা সাইরাসের বংশধর বলে দাবী করেন এবং দেশ থেকে হিজরী বর্ষপঞ্জি বাতিল করে দিয়ে তদস্থলে সাইরাস বর্ষপঞ্জি প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এই উদ্দেশ্যে কয়েক বছর পূর্বে তিনি কোটি কোটি ডলার ব্যয়ে সাইরাস' রাজবংশের আড়াই হাজার বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি জাঁকালো উৎসবেরও আয়োজন করেন। তাঁর এসব পদক্ষেপের একমাত্র লক্ষ্য ছিল ইরানী জনগণের মন থেকে ইসলামী চেতনা ও মুসলিম অনুভূতিকে মুছে ফেলা।

www.pathagar.com

বিপ্লবোত্তর ইরান

অধ্যাপক সিরাজুল হক

১২ই মে মঙ্গলবার। যাত্রা-পথের অনেক প্রতিকূলতা এড়িয়ে স্থানীয় সময় বিকেল সাড়ে তিনটায় তেহরানের মেহ্‌রাবাদ বিমান বন্দরে এসে পেঁছিলাম। ইরান সফর আমাদের জন্যে কোন প্রকার 'প্লেজার ট্রিপ' ছিল না। বিপ্লবোত্তর ইরান এবং ইরানী বিপ্লবের কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ই ছিল মূলত এ সফরের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর 'ইরান এয়ারে' আরোহণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তার সুস্পষ্ট আলামত পরিদৃষ্ট হলো।

একটু পরিষ্কার করেই বলি ঃ বিশাল আয়তনের যাত্রী বোঝাই ইরানী জাম্বো জেটটি রওয়ানা করার সাথে সাথে যাত্রীদের মুখনিসৃত 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি এবং দরুদ পাঠে আমি রীতিমতো আতংকিত হয়ে উঠলাম। 'কায়রো এয়ার ক্রাশের' কথা হঠাৎ মনে পড়লো। মনে করলাম না জানি আমাদের বিমানটি যাত্রার শুরুতেই কোন সংকটে পড়েছে। আসলে তার কিছুই না। বিপ্লবোত্তর ইরানে জনগণের মধ্যে যে সার্বিক পরিবর্তন এসেছে এটি তারই ফলশ্রুতি, তারই বহিঃ-প্রকাশ।

এখানে অত্যন্ত ছিমছাম পরিবেশ। ভারতীয় জাম্বোজেটের ঢালাও বিয়ার পরিবেশনের সে অস্বস্তিকর দৃশ্য এখানে চোখে পড়ল না, পরিলক্ষিত হলো না কোনপ্রকার প্রগলভতা। অনেকের হাতেই তসবিহ, সবার মুখেই আল্লাহ্‌র নাম। দুবাইস্থ ইরান এয়ারের কর্মকর্তাগণ পূর্বাহ্নেই আমাদের তেহরান যাত্রার কথা 'পার্স' অফিসে জানিয়ে দিয়েছিলেন। সে মোতাবেক 'পার্স' এর দুজন প্রতিনিধি বিমান বন্দরে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। 'পার্স' এর সন্নিকটে মোসাদ্দেক এভিনিউর হোটেল ভিক্টোরিয়ায় আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হলো।

১৯৮১ সালের ১২ই মে মঙ্গলবার থেকে ২১শে মে বৃহস্পতিবার

www.pathagar.com

পর্যন্ত এ দশদিন ইরানে অবস্থান করার সুযোগ হলো। আমাদের ইচ্ছা আকাংখা অনুসারেই 'পার্স' কর্তৃপক্ষ কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিলেন। ইরানী বিপ্লবের অবিসংবাদিত নেতা ইমাম খোমেনী, প্রেসিডেন্ট বনি-সদর, আই আর পি নেতা এবং প্রধান বিচারপতি ডঃ আয়াতুল্লাহ মুহাম্মদ বেহেশতীসহ বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাৎকার, 'পার্স' বার্তা সংস্থাসহ বিভিন্ন সংবাদপত্র অফিস পরিদর্শন, পবিত্র নগরী বলে কথিত কোম সফর, শাহের রাজপ্রাসাদ ও পঙ্গু হাসপাতাল পরিদর্শন, বেহেশতে জাহরা গোরস্থান জিয়ারত, পার্লামেন্টের অধিবেশনে যোগ-দান, ইরাকী বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ প্রভৃতি আমাদের কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না যে, অত্যন্ত খোলা মনেই তারা আমাদেরকে বিভিন্ন বিষয় জানতে ও দেখতে সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ইসলামের উদার মানবিক দৃষ্টিভংগি এবং গণতান্ত্রিক মানসিকতাই তাদেরকে সম্ভবত একাজে এতোটা অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল।

হ্যাঁ, আজকাল অনেক দেশেই 'বিপ্লব' কথাটিকে একটি 'ফ্যাশন' হিসেবে গ্রহণ করেছে। বস্তুত বিপ্লব অর্থ যদি একটি পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন এনে নতুন সমাজ ব্যবস্থার রূপায়ণ হয়ে থাকে, তা হলে এর সিকি ভাগও হয়তো সেখানে খুঁজে পাওয়া যাবে না। বিদেশের কথা কেন বলি। আমাদের দেশেও তো বিগত দিনগুলোতে দফাওয়ারী বিপ্লবের ঘোষণা এবং তা বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতির কথা শুনেছি বারবার। কিন্তু বাস্তব অর্থে আমাদের সমাজ-দেহে তার সাফল্যের নজির কতটা খুঁজে পাওয়া যাবে ?

কিন্তু আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, আধুনিক ইরান ১১ই ফেব্রু-য়ারীর সে বিপ্লবকে কোন ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করে নি। পাশ্চাত্যের পরিপূর্ণ আদলে গঠিত যুগযুগান্তের ঘুণেধরা ইরানী সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে একটি নতুন সমাজ ব্যবস্থার গোড়া পত্তনে ইরানী জনগণ ইমাম খোমেনীর নেতৃত্বে যেভাবে গভীর প্রত্যয় ও অনু-ভূতিতে বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছে, ইরানী সমাজের প্রতি পরতে পরতে তার স্বাক্ষর বিরাজমান। দশ দিন ব্যাপী এ সফরে আমার নিকট এটা অতীব স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে।

www.pathagar.com

ইরানের বিপ্লবকে সফল করে তোলার জন্যে সে দেশের আলেম ও যুব সমাজকে যে কি অপরিসীম মূল্য দিতে হয়েছিল তা ভাষায় ব্যক্ত করে শেষ করার মতো নয়। ইরান সফরের পূর্বে এতদ সম্পর্কিত যে সব খবর আমাদের হস্তগত হয়েছিল তাতে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। কারণ বিরুদ্ধবাদীদের বিরূপ প্রচারণা এবং বিশ্বসংবাদ মাধ্যমগুলোর বানোয়াট সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্রই এ বিপ্লব সম্পর্কে যে একটি গোলকধাঁধাঁ সৃষ্টি করে রেখেছিল ইরান সফরে গিয়ে তা আর আমাদের বুঝতে বাকী রইলো না। কিন্তু ইরানের ওলেমা সমাজের বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং তৎপ্রতি দেশের মজলুম জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন বিরুদ্ধবাদীদের সকল মিথ্যাচার এবং ষড়যন্ত্রের জালকে ছিন্নভিন্ন ক'রে দিয়েছিল।

একদিন দুদিন নয়, যুগের পর যুগ স্বৈরাচারী শাহ, সাভাক বাহিনী এবং তার দেশী-বিদেশী দোসরদের বিরুদ্ধে তারা লড়াই করেছেন। আর অকাতরে বিলিয়ে দিয়েছেন হাজার হাজার লোক তাদের বুকের তাজা রক্ত রাজপথে। তেহরানের রাজপথ, অলি-গলি, কোমের মাদ্রাসায়ে ফয়েজিয়ার দেয়াল গাত্রের যে ক্ষত চিহ্ন, লবণ হ্রদ এবং বেহেশতে জাহ্‌রা গোরস্থান আজও তার সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কোন লোক যদি ইরান সফর করতে চান, তা হলে কোম সফর এবং বেহেশতে জাহরা গোরস্থান যিয়ারত ব্যতীত সফর পূর্ণ হতে পারে না। যেকোন পর্যটককে এগুলো দেখানো হবে অত্যন্ত আগ্রহচিত্তে।

সে দিন ছিল ১৪ই মে বৃহস্পতিবার। আমরা চলেছিলাম কোমের উদ্দেশ্যে। ৫৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর আমাদের গাড়ী থামিয়ে দেয়া হলো। গাড়ী থেকে অবতরণ করে গাইড লবণ হ্রদটি দেখিয়ে দিয়ে বললেনঃ এই সেই লবণ হ্রদ যেখানে ১৫ হাজার বিপ্লবী মুজাহিদকে যাদের অধিকাংশই ছিলেন আলেম, মৃত কি জীবিত হেলিকপ্টারে করে নিক্ষেপ করা হয়েছে। আমরা সেখানে অনেকক্ষণ অবস্থান করলাম। ছবি তোলা হলো। আমি বার বার সে হ্রদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আর স্মরণ করলাম সে সব বীর মুজাহিদদের কথা যারা জালেমদের হাতে প্রাণ দিয়ে শাহাদাতের অপূর্ব মর্যাদা লাভ করেছেন।

বিকেলে কোম থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে আমাদের নিয়ে যাওয়া

www.pathagar.com

হলো বেহেশতে জাহরা গোরস্থানে—যেখানে হাজার হাজার শহীদ সমাহিত রয়েছেন।

সেদিন ছিল ইরানী জনগণের একটা বিশেষ শোক দিবস। অর্থাৎ দুলেতু নামক কারাগারে ইরাকী বাহিনীর গোলা বর্ষণে প্রায় দু'শ ইসলামী রক্ষী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তির নিহত হওয়ার নারকীয় ঘটনার স্মরণে সেদিন শোক পালন করছিলেন ইরানী জনগণ।

সে কি অদ্ভুত দৃশ্য! আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিছিল করে গোরস্থানে প্রবেশ করছে। এমনকি ছোট ছোট শিশুরাও মাতম করে, কোরাস গেয়ে গেয়ে সে বিশাল গোরস্থানে প্রবেশ করছিল। নারী-পুরুষ, কিশোর-কিশোরী এবং শিশুদের স্বজন হারানো ব্যথার ক্রন্দন আর দোয়া-দরুদ পাঠে সমগ্র গোরস্থানে একটি খন্ড কিয়ামত বলে মনে হচ্ছিল। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু কবর আর কবর। গোরস্থানের বিশালতা দেখে যে কোন লোক চমৎকৃত না হয়ে পারে না। এখানে কালের সাক্ষী হিসেবে শহীদরা শুয়ে আছে। অধিকাংশ কবরের গায়ে গায়ে (পরিচিতি হিসেবে) ছবি লটকিয়ে রাখা হয়েছে। ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে শহীদদের অধিকাংশই তরুণ। আহা! সেকি বেদনাদায়ক দৃশ্য! শহীদ মাহমুদ তেলেগানিসহ অনেকেরই কবরের কাছে এতটো ভীড় পরিলক্ষিত হলো যে আমরা বহু চেষ্টা করেও সেখানে পেঁছিতে পারলাম না।

এ অবস্থা শুধু বেহেশতে জাহ্‌রাতেই নয়-মাশাদ, কোম, ইস্পাহান ও অন্যান্য ইরানী শহরেও একই অবস্থা। আমরা দাঁড়িয়ে শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা জানালাম। গোরস্থানে সমাগত হাজার হাজার জনতার সাথে আমরা একাত্ম হয়ে গেলাম। আমার মনে হলো আমিও যেন অসংখ্য স্বজনকে হারিয়েছি। আর এই স্বজন হারানোর মতো ব্যথা-বেদনা নিয়েই সেদিন শেষ গোধূলি লগ্নে হোটেলের দিকে শহরে প্রত্যাবর্তন করলাম।

আরেকটি কথা। দেশে থাকতে মাঝে মাঝে ইরানের সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, আলেমদের সম্পর্কেও অনেক আজগুবি কথাবার্তা শুনতাম। আর তা হলো এই যে, তারা আলী (রাঃ) কে নবীর আসনে বসিয়ে সম্মান করে—এ ধরণের আরো আরো কত কি! কিন্তু কোমের সে বিখ্যাত মাদ্রাসায়ে ফয়েজিয়া এবং তৎসন্নিহিত হযরত মাসুমার মাজারে প্রবেশের কালে আমরা তার জবাব পেয়ে গেলাম। অর্থাৎ সেখানকার

www.pathagar.com

মূল ফটকে বড় বড় অক্ষরে পুরো কলেমায়ে শাহাদাত উৎকীর্ণ রয়েছে। আমার দুঃখ হয় যে, আমাদের কোন কোন আলেম পর্যন্ত শিয়া-সুন্নীর প্রভেদ ও বিরোধ আবিষ্কার করতে গিয়ে এসব আজগুবি তথ্য প্রচার করে বেড়ায়—যা সর্বৈব মিথ্যা।

পৃথিবীর প্রায় সকল মুসলিম দেশেই আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষার একটা ক্ষীণতম ব্যবস্থা দীর্ঘদিন থেকে চালু হয়ে এসেছে। অবশ্য এমন একদিন ছিল যেদিন মাদ্রাসা শিক্ষাই ছিল মৌলিক শিক্ষা ব্যবস্থা—যার অধীন অতীতে হাজার হাজার মুসলিম মণীষী জন্মলাভ করেছিলেন। তাদের প্রতিভা স্পর্শে মুসলিম জাহানের সর্বত্র জ্ঞান-প্রদীপ প্রজ্জলিত হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে আমরা ইমাম গাজ্জালী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ প্রমুখের নাম উল্লেখ করতে পারি। অতীতের সেই গৌরবময় দিনগুলোতে মাদ্রাসা শিক্ষার জন্যে ব্যয় করাও হতো প্রচুর অর্থ। ৪৫৭ হিজরী সালে প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদ্রাসার নির্মাণ কাজে নিজামুল মুলক ২ লাখ দিনার ব্যয় করেছিলেন। ছাত্রদের ভরণ-পোষণের জন্যেও প্রতি বছর ব্যয় হতো পঞ্চাশ সহস্রাধিক দিনার।

তবে মুসলিম জাহান তার সে অতীত গৌরবকে কোথাও ধরে রাখতে সক্ষম হয় নি। ইউরোপের বস্তুবাদী শিক্ষা ও সভ্যতার সয়লাবে একদিকে যেমন মুসলমানদের মন-মানসে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, অন্যদিকে মাদ্রাসা বা ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর একটি পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ চাপ সৃষ্টি হওয়ার কারণে তা আর কোথাও মজবুত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সক্ষম হয় নি। আধুনিক ইরানও এর ব্যতিক্রম নয়। অর্থাৎ ইরানে স্মরণাতীত কাল থেকে যে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়ে এসেছে তার ওপর আঘাত এসেছে বার বার। এ প্রসংগে ইসলামী বিপ্লবের অন্যতম সূতিকাগার কোমের মাদ্রাসায়ে ফায়েজিয়া এবং তেহরানের বাহরিস্তান এলাকার প্রকান্ড মাদ্রাসায়ে আলী শহীদ মোতাহারীর কথা উল্লেখ করতে পারি। ইরানের রাজতান্ত্রিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে মাদ্রাসা দু'টি দীর্ঘদিন বন্ধ ছিল। ক্ষমতাচ্যুত শাহের পিতা রেজা খান কোমের এই বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ করে দিয়েছিলেন। অতঃপর ১৯৪১ সালে শাহ ক্ষমতা ত্যাগ করার পর আবার তা চালু হয়। আর মাদ্রাসায়ে আলী মোতাহারী আবার চালু হয়েছে বিপ্লবের পরে।

www.pathagar.com

১৫ই মে শুক্রবার। **Poor area** বলে কথিত তেহরানের দক্ষিণ অঞ্চল দেখতে গিয়েছিলাম। বিকেলে ফেরার পথে মাদ্রাসায়ে আলী মোতাহারীতে প্রবেশ করলাম। মাদ্রাসাটি দেখলে পর্যটকদের চক্ষু শীতল না হয়ে পারে না। অত্যন্ত সুষমামন্ডিত এবং কারুকার্য খচিত এই বিশাল ও প্রকান্ড মাদ্রাসাটির চারদিকে বিরাট বিরাট গেট বা ফটক রয়েছে। আমরা আসরের নামায মাদ্রাসার মসজিদেই পড়লাম।

সে যাই হোক, ইরানের শাহী ষড়যন্ত্র কোন প্রকারেই শিক্ষার এ ক্রমধারাকে দমিয়ে রাখতে পারে নি। বরং এতদসত্ত্বেও ফেরদৌসী তুসী, শেখ মুসলেহ উদ্দীন সাদী এবং ইমাম গাযযালীর দেশ ইরান দ্বিতীয় বারের মতো এটা প্রমাণ করলো যে, এই শিক্ষা ব্যবস্থার অধীন শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেরা আধুনিক ধারার সাথে সমন্বয় রক্ষা করে একটি সফল ইসলামী বিপ্লবের নেতৃত্ব দানে একান্তই সক্ষম। বিপ্লবী ইরানের স্থপতি ইমাম খোমেনী এবং তাঁর লাখ লাখ অনুসারী আয়াতুল্লাহ্‌রাই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইমাম খোমেনী সাধারণ অর্থে ছিলেন একজন ধর্মীয় শিক্ষক। পবিত্র নগরী কোমে তিনি দু'যুগেরও বেশী সময় শিক্ষকতা করেছেন। আর আধুনিকতাবাদী ও পাশ্চাত্যপন্থীদের নিকট তাঁর ও তাঁর অনুসারীদের পরিচয় কট্টর মোল্লা বই আর কিছুই নয়।

কোন পর্যটক যদি তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত জুমার জামাতে শরীক হন তা হলে তাদের ইসলামী স্পিরিট এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির অতুলনীয় নিদর্শন দেখে স্তম্ভিত না হয়ে পারবেন না। মনে হবে যেন জুমার জামাতে শরীক হবার জন্যে জনসমুদ্রের ঢল নেমে আসছে চারিদিক থেকে। সত্যিই তেহরানের জুমার জামাত উপভোগ করার বিষয়। এ শুধু জামাতই নয়, জাতীয় জাগরণের মহান মিলন কেন্দ্র। তেহরানবাসী প্রতি শুক্রবারই মিলিত হয় এমনিভাবে। ১৫ই মে শুক্রবারে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের সে বিশাল জুমার জামাতে শরীক হবার মতো সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বেলা সাড়ে এগারটায় প্রচন্ড ভীড় অতিক্রম করে আমরা জামাতের অগ্রভাগে গিয়ে হাজির হলাম। গাইড আমাদের জন্যে ইমামের এক কাতার পিছনেই জায়গা করে দিলেন। আমাদের সামনেই উপবিষ্ট হলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী (এবং পরে প্রেসিডেন্ট) মোহাম্মদ আলী রাজায়ী এবং আরো কিছু সংখ্যক পদস্থ

www.pathagar.com

সরকারী কর্মকর্তা। আমাদের উপস্থিতির কিছুক্ষণের মধ্যেই ইমাম খুতবা দিতে উঠলেন। তিনি খুতবার মধ্যে বিশ্ব-পরিস্থিতিসহ গোটা মুসলিম জাহানের হাল-অবস্থার ব্যাখ্যা করলেন। এতো বড় লম্বা খুতবা জীবনে আর কখনো শুনিনি। আমার যতদূর মনে পড়ে দুঘন্টা ধরে তিনি খুতবা দিলেন। আর এরই মাঝখানে এই বিশাল জনতার পক্ষ থেকে মুহুর্মুহু ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল অসংখ্য শ্লোগান আর 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ইমাম হোসেন আলী খামিনীই ছিলেন সেদিনের জুমার ইমাম। এখানে অবাক হবার কিছু নেই। এটাই হচ্ছে ইসলামের রাষ্ট্র দর্শনের গূঢ় কথা যে, একজন মসজিদের ইমাম এবং একজন রাষ্ট্রের ইমামকে ইসলাম ভিন্ন করে দেখে না। ইমামতের যিনি হকদার তার উপরই তা ন্যস্ত হয়; চাই তা নামাযের জামাত কায়েমাথেই হোক আর রাষ্ট্রের কর্ণধার হিসেবেই হোক।

শাহের বালাখানা

বর্তমানে ইরান সফরকারী পর্যটকদের আরেকটি বড় আকর্ষণ হচ্ছে ক্ষমতাচ্যুত শাহের বালাখানাগুলো। আমাদের কর্মসূচীর মধ্যে শাহের বালাখানাগুলো দর্শনের একটি বন্দোবস্ত পূর্বাহ্নেই করে রেখেছিলাম। শাহ তার অতৃপ্ত কামনা-বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্যে ৩৭ বছরের জিন্দেগীতে ৪টি রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এগুলো হচ্ছে ঃ নিরাভরন, সাদাবাদ, গুলিস্তান ও মর্মর প্যালেস। এই প্রতিটি রাজপ্রাসাদকে কেন্দ্র করে আরো কত শত শত সুরম্য অট্টালিকা যে নির্মিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শাহের দু'নম্বর বালাখানা সাদাবাদ প্যালেসেই কেবল আমাদের প্রবেশের সৌভাগ্য হয়েছিল। অন্য তিনটি রাজ প্রাসাদের শুধু বহিরঙ্গ দেখেই আমাদের দর্শন পিপাসা মিটাতে হয়েছে। এসব বালাখানা হচ্ছে শাহের ভোগবাদী এবং জৌলুসপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবি। আর এগুলোর অভ্যন্তর ভাগ যেভাবে সুসজ্জিত করা হয়েছে তাতে শাহের বিকৃত ও কুরুচিপূর্ণ মানসিকতাই একান্তভাবে ফুটে উঠেছে। মজলুম, দরিদ্র ও নিঃস্ব ইরানী জনগণের শোষিত সম্পদের বিনিময়েই শাহ তার নিজের ও পরিবার-পরিজনের জন্যে এ ব্যবস্থা করেছিলেন। তেহরান নগরীর এক বিশাল এলাকাই এ গুলোর দখলে।

www.pathagar.com

সেদিন ১৬ই মে শনিবার। প্রাতঃরাশ গ্রহণের অব্যবহিত পরেই দেখতে পেলাম গাড়ী এসে হাজির হলো হোটেলে। আমাদের নিয়ে আসা হলো শাহের দু'নম্বর প্যালেস সাদাবাদ ভবনে। বিপ্লবী রক্ষী এবং পদস্থ পুলিশ ও বেসামরিক ব্যক্তিদের দ্বারা রাজপ্রাসাদটি সুরক্ষিত। গাইড ইউসুফ আমীরপুরী প্রধান ফটকের সামনের অফিস ঘরটিতে নিয়ে আমাদের বসালেন। অনেকক্ষণ পরে আমরা ভেতরে প্রবেশের অনুমতি পেলাম। প্রধান ফটক পার হয়ে আমাদের অনেক দূর যেতে হবে। একজন ড্রাইভার একটি নতুন গাড়ীতে করে আমাদের নিয়ে চললেন রাজপ্রাসাদের অভিমুখে। ঘন কর্মচাঞ্চল্য ও ব্যস্ততার দিক দিয়ে ইরান তথা তেহরানবাসীদের জীবনযাত্রা বোম্বের জীবন-যাত্রার সাথে তুলনীয়। আমাদের মতো কুঁড়ে হয়ে বসে থাকার মত দুদন্ড সময় কারো হাতে নেই। সকলেই ছুটছে উদ্যম গতিতে যার যার কাজে—'কারো পানে ফিরে চাহিবার নাই যে সময় নাই।' পথে ঘাটে অফিসে আদালতে সর্বত্র এ ব্যস্ততা–ব্যস্ততা। শুধু পুরুষরাই নয়—মহিলাদের মধ্যেও প্রত্যক্ষ করেছি অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা ও উদ্যমশীলতা। আমাদের এদেশে এটা কল্পনাও করা যায় না। আমি যতটুকুন প্রত্যক্ষ করেছি, তাতেই নির্দ্বিধায়ই ঐকথা বলতে পারি যে, ইরানী মহিলাদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ও কর্ম প্রবাহ পুরুষদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়, বরং বেশী। ইসলামের মূলনীতিগুলোকে অনুসরণ করে তারা পুরুষদের পাশাপাশি জীবনের সর্বক্ষেত্রে কর্মচাঞ্চল্যের স্বাক্ষর রেখে চলেছেন।

১৭ই মে রোববার। এ দিনের কর্মসূচীর মধ্যে ছিল যুদ্ধ সামগ্রী সংগ্রহের নিমিত্ত সাহায্য কেন্দ্রসমূহ এবং পঙ্গু হাসপাতাল পরিদর্শন। খুব সকালেই বেরিয়ে পড়তে হলো। 'পার্স' সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধি জনাব আহমদ চেরাগ আমাদের নিয়ে চললেন বিভিন্ন কেন্দ্রে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে সদ্য প্রত্যাগত ভাই আহমদ চেরাগের মুখচ্ছবি এখনো যেন আমার স্মৃতিতে ভাস্বর হয়ে আছে। মনে প্রাণে বিপ্লবী অথচ এরূপ মাটির মানুষের সাথে আমার জীবনে খুব কমই সাক্ষাৎ ঘটেছে। উল্লেখ্য যে, এ সাহায্যের কেন্দ্রগুলোর কর্মতৎপরতার কথা মনে করলে একটি সংগ্রামী জাতির প্রতিচ্ছবিই বার বার অন্তরে ভেসে উঠে। একদিকে সাধারণ মানুষ নিজেদের সাধ্যানুযায়ী স্বর্ণালংকার থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন দ্রব্য সামগ্রী নিয়ে আসছে যুদ্ধ তহ-

www.pathagar.com

বিলের জন্যে সাহায্য হিসেবে, অন্যদিকে শত শত মহিলা ও পুরুষ অবিশ্রান্তভাবে পালাক্রমে কাজ করে যাচ্ছেন এসব কেন্দ্রে। কোন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে নয়—স্বেচ্ছাসেবী হিসেবেই তারা কাজ করে যাচ্ছেন দিনের পর দিন। আমরা একে একে এ ধরণের চারটি কেন্দ্র পরিদর্শন করলাম। কেন্দ্রগুলোর বৈশিষ্ট্য এই যে, এখানকার কর্মীরা সকলেই মহিলা—পুরুষরা রয়েছেন শুধু যোগদানের জন্যে। এক একটি কেন্দ্রে এক এক ধরনের কাজ হচ্ছিল। এর কোনটিতে তৈরী হচ্ছিল শুধু যুদ্ধরত সৈনিকদের যাবতীয় পোশাক-পরিচ্ছদ। আবার কোনটিতে দেখতে পেলাম প্যাকিং করা হচ্ছে—অষুধ আর অষুধ।

গাইড পরিচয় করিয়ে দেবার সাথে সাথেই মহিলাগণ আমাদের সালাম করলেন এবং হাত উঁচু করে শ্লোগান দিতে শুরু করলেন ঃ আল্লাহু আকবার ! আল্লাহু আকবার !! মার্গবার ইয়াযিদ সাদাম ওয়া মুনাফেকীন, দরুদ বর মুস্তফা ওয়া মুমেনীন ইত্যাদি। শ্লোগান শুনতে শুনতে আমার তা রপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সাহায্য কেন্দ্রগুলোতে ইরানী জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত দানের যে চিত্র দেখতে পেলাম আমাকে তা সাদাবাদের যুগের সে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিল—স্মরণ করিয়ে দিল আল্লামা ইকবালের ভাষায় ঃ 'পর-ওয়ানে কে চেরাগ আওর এনাদেল কো ফুল বহু—সিদ্দিককে লিয়ে হায় খোদাকা রাসুল বহু। আজাদী স্কোয়ারের পার্শ্ববর্তী একটি বিরাট কেন্দ্রে আমরা উপনীত হয়েছি মাত্র। অমনি দেখতে পেলাম একজন ভদ্রলোক ও ভদ্র মহিলা গাড়ীতে করে এসে হাজির হয়েছেন একটি স্বর্ণপিন্ড নিয়ে—যার পরিমাণ হচ্ছে আড়াই কেজী। এভাবে আমাদের উপস্থিতিতেই জনৈক ভদ্রলোক পেঁাছে দিয়ে গেলেন অন্য একটি কেন্দ্রে পাক্কা দুই কেজি পরিমাণ স্বর্ণ ও স্বর্ণালংকার। এ হচ্ছে বিপ্লবোত্তর ইরান ও ইরানী জনগণের ত্যাগ-তিতিক্ষা এবং সর্বস্ব বিলিয়ে দেয়ার অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সেবার বিরল দৃষ্টান্ত

গত ক'দিন বেশ শীত শীত অনুভূত হলেও এই দিন একটু গরম পড়েছিল। তাছাড়া সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত একটানা ঘোরাঘুরির ফলে

www.pathagar.com

ক্লান্তও হয়ে পড়েছিলাম প্রচুর। কিন্তু তা সত্ত্বেও স্বস্তিতে নিঃশ্বাস ফেলার সুযোগ হলো না আমাদের। বিকেল তিনটা না হতেই গাড়ী এসে হাজির হলো হোটেলে। যেতে হবে ১৪/১৫ কিলোমিটার দূরে পঙ্গু-হাসপাতাল দেখতে।

বেহেশতে জাহরা গোরস্থানের সন্নিকটে একটি উন্মুক্ত পরিবেশে অত্যন্ত আধুনিক ফ্যাশানে নির্মিত হয়েছে এই পঙ্গু হাসপাতালটি (disabled hospital)। আমরা বিকেল সাড়ে তিনটায় গিয়ে ওখানে পেঁছিলাম। দক্ষিণমুখী এই হাসপাতালটির সম্মুখেই রয়েছে একটি বিস্তীর্ণ মাঠ এবং মাঠের মধ্যে বৃহদায়তনের একটি ফোয়ারা। চার-দিকেই সবুজের সমারোহ। এর পিছনে এবং আগে পাশের সর্বত্র রয়েছে বিপুল বিস্তৃত গোলাপের বাগান—সে-কি অপূর্ব দৃশ্য! পৃথিবী খ্যাত সে ইরানী গোলাপ ফুলের মনমাতানো দৃশ্য অত্যন্ত কিছুক্ষণের জন্যে হলেও অবলোকনের সৌভাগ্য হলো। লাল-নীল তথা নানা বর্ণের গোলাপ ফুলের গন্ধে বিমোহিত হলাম—দু'একটি ফুল হাতেও নিলাম তুলে।

হাসপাতালের রোগীদের সেবা শুশ্রূষা দেখে আমরা বিলকুল তাজ্জব বনে গেলাম। ৭২ জন রোগীর জন্য ২২১ জন সেবক ও সেবিকা নিয়োজিত—এ ধারণা অবাক লাগে। ইমামের নির্দেশে যত রকমের সুযোগ-সুবিধা দরকার তার ব্যবস্থা করা হয়েছে এসব রোগীর জন্যে। পালাক্রমে ৭ জন ডাক্তার তাদের সামগ্রিক তত্ত্বাবধান করে ব্যবস্থা দেন। দ্বিতল এই হাসপাতালটির কেপাসিটি ১৫০ জনের হলেও আমরা যেদিন তা দেখতে গিয়েছিলাম সেদিন রোগীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৭২ জন। হাসপাতালটির নির্মাণ কাজ তখনো সম্পন্ন হয় নি; তাছাড়া এ মূল ভবনের পার্শ্বেই আরেকটি বহুতলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে দেখতে পেলাম। উক্ত ভবনটির নির্মাণ কাজ শেষ হলে হাসপাতালের রোগী সংকুলানের Capacity হবে ৫৫০ জন।

আমরা প্রতিটি ওয়ার্ড এবং পঙ্গুদের ব্যায়ামাগারটি (Massage room) ঘুরে দেখলাম। রোগীদের সাথে কুশল আলাপ হলো। হাসপাতালটির নির্মাণ কৌশল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে অবাক হলাম। সাধারণত হাসপাতালে পূতি-গন্ধময় পরিবেশ যেভাবে পরি-লক্ষিত হয়ে থাকে এখানে তা অনুপস্থিত। আমি আরো অবাক হলাম

www.pathagar.com

রোগীদের পরিচর্যার বহর এবং তাদের প্রতি সরকারের সরবরাহকৃত সুযোগ-সুবিধার প্রাচুর্য দেখে। প্রত্যেক রোগীর শয্যা পাশেই ছোট ছোট ফ্রিজে সাজানো রয়েছে প্রচুর ফল-ফলাদি—যা তারা নিজ নিজ শয্যায় বসেই সংগ্রহ করতে পারে। এ ছাড়া রয়েছে প্রত্যেকের জন্যে এক সেট রেডিও এবং মিনি সাইজের টেলিভিশন।

রোগীদের পরিচর্যা ও সেবার জন্যে এ ধরণের পরিপাটি ব্যবস্থা অন্য কোন উন্নত দেশে আছে কিনা জানি না। সাভাকের নির্যাতন অথবা ইরাকী হামলার শিকার এসব পঙ্গু ভাই-বোনদের করুণ চিত্র আমাদের হৃদয় মনকে বিগলিত করে দিলেও তাদের নৈতিক মনোবল ইরানের ইসলামী বিপ্লবের প্রতি তাদের অকুণ্ঠ সমর্থনের কথা শুনে আমরা প্রীত হলাম—আনন্দ অনুভব করলাম পঙ্গু হয়েও তারা গর্ববোধ করছে দেখে। এর পর হাসপাতালের প্রধান পরিচালক ডাক্তার মজিদী আমাদের নিয়ে বসালেন তার চেম্বারে। প্রায় একঘন্টা তাঁর সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ হলো। তিনি আমাদের সকল ধরণের প্রশ্নের জবাব দিলেন। তিনি আমাদের অষুধের স্টোর রুমে নিয়ে গেলেন এবং জানালেন যে, তার এখানে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার অষুধই মজুদ রয়েছে। অত্যন্ত হাসি-খুশী চেহারা এবং করিৎকর্মা ডাক্তার মজিদী আমাদের আপ্যায়ন করেন। অতঃপর আমরা তাঁর কাছে থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি।

ইরাকী বন্দীদের সাক্ষাৎকার

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, ইরাকী যুদ্ধ-বন্দীদের সাথে সাক্ষাৎ করার একটি তীব্র আকাংখা আমাদের আগে থেকেই ছিল। সে প্রেক্ষিতে সফরের কর্মসূচীর মধ্যেও তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। সেদিন ছিল ১৭ই মে—সোমবার। সকাল প্রায় দশটার দিকে আমরা গিয়ে উপস্থিত হলাম ফাতেমী এভিনিউতে অবস্থিত জামশেদিয়া কারাগারের প্রধান ফটকে। কয়েক মিনিটের মধ্যে কারা কর্তৃপক্ষ আমাদের স্বাগতম জানালেন ভেতরে প্রবেশের জন্যে। গাইড হিসাবে আজ আমাদের সাথে ছিলেন পার্সের (ইরানা) জনাব হামিদি তিনি ইস্পাহানের বাসিন্দা।

জামশেদিয়া কারাগার! দৃশ্যত এটি একটি বিরাট জমিদারের

www.pathagar.com

বাগান বাড়ীর মতোই। অনেক দূর হেঁটে যাবার পর আমরা গিয়ে উপনীত হলাম একটি হল ঘরের মধ্যে। এখানেই রয়েছে ইরাকী যুদ্ধ বন্দীরা। তখন ইরাকী যুদ্ধ বন্দীদের সংখ্যা ছিল পাঁচ হাজার। (আর এখন প্রায় ষাট হাজার) আর ঐ কারাগারে ছিল সত্তর-আশি জনের একটি দল। আমাদের দেখা মাত্র বন্দীরা অত্যন্ত উৎফুল্ল মনে এগিয়ে এলো। বন্দীদের প্রতি তাকিয়ে মনে হলো বেশ আরাম আয়েশেই আছে তারা—বন্দীত্বের কোন লক্ষণই নেই তাদের মধ্যে। ইরানের লোকেরা তাদেরকে বলে মেহমান। আর তারা নিজেরাও রয়েছে সে মর্যাদায়ই। জেল কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত খোলাখুলি ভাবে তাদের সাথে আলাপ করার সুযোগ দিয়েছিলেন আমাদেরকে। কুশল আলাপ ছাড়াও আমার ইচ্ছে মতো তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছি। তাদের সাথে কারা কর্তৃপক্ষের আচরণ খাদ্য দ্রব্য সরবরাহ, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে তাদেরকে প্রশ্ন করেছি। তাদের উত্তর শুনে আমরা স্তম্ভিত হয়েছি যে, তারা ইরানী কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে মেহমানোচিত এবং ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে আসছে। আমি তাদের অনেককেই এই মর্মে একটি প্রশ্ন করেছিলাম যে, কোন জিনিসটি তাদেরকে এ যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তারা সকলেই এর জবাব দিল ঃ মজবুরান।

এখানে একটি কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সত্তর/আশিজন বন্দীর অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন বিদেশী ভাষায় তাদের কথা বলা ছিল অসম্ভব। তাই অধিকাংশের সাথে আমি ভাংগা ভাংগা আরবীতে কথাবার্তা সারলাম। অবশ্য জেলখানার জনৈক সুপারভাইজার যিনি এককালের কারবালার বাসিন্দা এবং উচ্চ শিক্ষিত তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের দোভাষীর কাজটা সেরেছেন। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, আমি ভদ্রলোকের নামটি ভুলে গিয়েছি। ভদ্রলোক ইমামের একজন মস্তবড় ভক্ত এবং স্বদেশ ভূমি ত্যাগ করে ইরানে এসে ঠাঁই পেতেছেন, আর একাত্ম হয়ে গেছেন ইরানের ইসলামী বিপ্লবের সাথে।

বন্দীরা আমাদের দেখে খুশীতে গদগদ। অনেকেই সিগারেট অফার করল। এখানে কয়েকজন যুদ্ধাহত বন্দীও ছিল...যারা তখন চিকিৎসাধীন রয়েছে। আমি তাদের শয্যাপাশে গিয়ে বসলাম এবং কুশল আলাপ করলাম। আমরা কলম ও কাগজের মানুষ একথা শোনার পর

www.pathagar.com

তারা খুব আশান্বিত হলো এবং বলল আপনারা গিয়ে অবশ্যই কিছু লিখবেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম কি লিখব ? তাদের সকলেই বলল ঃ সুলেহ, সুলেহ ! তারা আরো জানালো—ইরাকের জনগণ মোটেই এ যুদ্ধ চায় না, তারা চায় সুলেহ—মীমাংসা। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম তাদেরকে বাধ্য করেছেন লড়াই করতে।

কারাগারে প্রত্যেক কয়েদীর শয্যাপাশেই দেখতে পেলাম প্রচুর ফলমূল এবং ভূরি ভূরি সিগারেট। তাদের চাহিদা অনুযায়ী কর্তৃপক্ষ এগুলো তাদের জন্যে যথারীতি সরবরাহ করছেন বলে তারা জানালেন। এ ছাড়া তাদেরকে দৈনিক তিন বেলা খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে। আরেকটি মজার ব্যাপার এই যে, কারা কর্তৃপক্ষ বিপুল সংখ্যক ইসলামী বই পুস্তক—যা আরবীতে লেখা হয়েছে, তাদেরকে পড়তে দিয়েছেন—দিয়েছেন কালামে পাক। এভাবে তাদের সময় কাটাবার একটা সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। আমরা উঠি উঠি করেও সহজে উঠতে পারলাম না। কাজেই বেশ দীর্ঘ সময়ই অবস্থান করতে হলো সেখানে। কারাগার থেকে বের হবার পথে জনৈক কর্মকর্তা বললেন ঃ ব্রাদার ! আপনারা দয়া করে একবার ইরাকেও যাবেন এবং আমরা কি ধরণের আচরণ করছি তা যেমন স্বচক্ষে দেখে গেলেন, তারা আমাদের বন্দীদের সাথে কি ধরণের আচরণ করছে তাও একবার দেখে আসুন এবং আপনাদের অভিজ্ঞতা লিখুন।

শিয়া-সুন্নী প্রসঙ্গ

ইরান সফরের প্রাক্কালে আরেকটি বড় ধরনের যে প্রশ্ন আমার মনে সর্বদা উঁকি-ঝুঁকি মারতো তা ছিল শিয়া-সুন্নী প্রসঙ্গ। বাংলাদেশে শিয়াদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। তাই শিয়া সম্প্রদায়ের লোকদের জীবনাচার এবং আকিদা সম্পর্কে বিশেষ কিছু প্রত্যক্ষ করার মতো সুযোগ আমার কখনো হয়ে উঠে নি। তবে এক শ্রেণীর লোক (বিশেষত আলেম) এ মাজহাবী ফেরকাবন্দী তথা শিয়া-সুন্নী প্রশ্নটিকে যেভাবে ফলাও করে প্রচারাভিযানে নেমেছিলেন তাতে আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, ১১ই ফেব্রুয়ারীর ইসলামী বিপ্লব সফল হবার পর বিশ্বের সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো চাচ্ছিল ছলে-বলে কলে-কৌশলে যেভাবেই হোক এ বিপ্লবকে নস্যাৎ করতে হবে। আর এ কারণেই তারা মুসলমানদের মধ্যে একটি অনৈক্য সৃষ্টির প্রয়াসে এবং তাদেরকে

www.pathagar.com

ইরানী বিপ্লবের প্রভাব থেকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যে শিয়া-সুন্নীর মতো অতীব সেকেলে এবং নাজুক প্রশ্নটিকে আবার নতুন করে পরিবেশন করতে থাকে। দুর্ভাগ্যের বিষয় হলেও সত্য যে, আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলমান ভাই এই উস্কানীর শিকার হয়েছেন এবং বক্তব্য-বিবৃতির মাধ্যমে তারা যে কাজটা করেছেন তা কোথাও পাত্তা না পেলেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহ তথা ইসলামের দুশমনরা যে কিঞ্চিত হলেও লাভবান হয়েছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

মুসলিম সমাজে শিয়া-সুন্নী দু'টি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় অতীত ইতিহাস থেকেই চলে এসেছে—যেমন চলে এসেছে হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাজহাবসমূহ। কিন্তু ইরানের ইসলামী বিপ্লব লগ্নে আমাদের এতদ্দেশে এবং আরব জাহানে যে ভাবে এ ব্যাপারে নতুন করে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির চেষ্টা করা হয়েছে অথবা এখনো হচ্ছে নিকট অতীতের তা তেমনটি ঘটেনি।

এ কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি এমনি এক পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, (ইরানী বিপ্লবকে ঠেকানোর উদ্দেশ্যে) মুসলিম জাহানের কেউ কেউ বিপ্লবের নেতা ইমাম খোমেনীকে কাফের ফতোয়া দিতেও কসুর করেনি। অথচ আল্লাহ্‌র একত্ব, রসূলের নবুয়ত ও আখেরাতের ব্যাপারে শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা সুন্নীদের মতোই আকিদা পোষণ করে।

ইরান ভ্রমণে যাবার অন্যান্য বিষয়ের মতো এ প্রশ্নটিও আমার মনে ছিল এবং যতদূর সম্ভব এ ব্যাপারে একটি সঠিক তথ্য লাভের চেষ্টা করেছি।

ইরানের অধিকাংশ লোকই শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত—এ কথার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। কিন্তু তাই বলেই ইরানের এ ইসলামী বিপ্লবকে শিয়া বিপ্লব বলে চালিয়ে দেবার কোন হেতু নেই। অথচ বাইরে আমাদের শত্রুরা যেভাবে এ বিষয়টিকে উসকানি দিয়ে আমাদেরকে দ্বিধাবিভক্ত করতে চাইছে আমরাও যেন অলক্ষ্যেই তাদের শিকারে পরিণত হচ্ছি।

আমরা এখানে থাকতে শিয়াদের আকিদা-বিশ্বাস সম্বন্ধে অনেক কাল্পনিক ও গাঁজাখোরী কথা শুনেছি, শুনেছি সুন্নীদের ওপর শিয়াদের নির্যাতনের অনেক কল্প-কাহিনী। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইরানে

www.pathagar.com

তার কোন অস্তিত্ব নেই। শিয়ারা হযরত আলী (রাঃ) হযরত মুহাম্মদ (সঃ) এর চেয়ে বড় অথবা তার সমতুল্য বলে মনে করে', 'কালেমার শেষাংশ তথা মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহকে তারা স্বীকার করে না", 'জুমার জামাত অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করে না ইত্যাদি কত আজগুবি কথা আমরা দেশে বসে শুনেছি। কিন্তু আসলে কি ইরানে এ সবের কোন অস্তিত্ব আছে? অনেকে আবার অজ্ঞতাবশত ইসমাঈলী সম্প্রদায়ের কিছু কিছু আকিদা-বিশ্বাসকে শিয়াদের নামে চালিয়ে দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে থাকেন।

১৯শে মে মঙ্গলবার। ইরানী পার্লামেন্টে গিয়েছিলাম তা পরিদর্শন করার জন্যে। তবে আমার বিশেষ ইচ্ছা ছিল পার্লামেন্টের সদস্য সুন্নী নেতা মাওলানা নজর মোহাম্মদ খানের সাথে সাক্ষাৎ করা এবং শিয়া সুন্নী প্রশ্ন সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব অবহিত হওয়া। অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। মজলিসের বিরতির সময় তাঁর সাথে আমি অর্ধ ঘন্টারও বেশী আলাপ করেছি। তাঁর সাথে আলাপের মধ্য দিয়ে যে জিনিসটি উপলব্ধি করেছি তার মর্মার্থ হচ্ছে বিপ্লবোত্তর ইরানে এ প্রশ্নটি একান্তই গৌণ। ইমামও এ প্রশ্নের নিরসন চান। আর এ কথা সর্বজন বিদিত যে, ইমামের কথাই গোটা জাতির কথা।

বহির্বিশ্বের প্রচারণা যত তীব্রই হোক না কেন, এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইরানের ইসলামী বিপ্লব সফল হবার অনেক পূর্ব থেকেই ইরানী জাতি সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ইসলামের শত্রুদের মোকাবিলায় সংহত হয়েছিল। শিয়া-সুন্নী নির্বিশেষে সকলেই এসে বুক পেতে দিয়েছিল সাভাকের কামান ও ট্যাংকের সম্মুখে।

যে কর্মীদের নিয়ে প্রশ্নের অবতারণা করা হচ্ছে বিপ্লবের প্রাক্কালে কুর্দিস্তানের সেবক সুন্নীরা বার বার এ শ্লোগান উচ্চারণ করেছে: শিয়া-সুন্নী ফারাকে নিস্ত, রাহবারে মা খোমেনীস্ত—শিয়া-সুন্নী ভাই ভাই, খোমেনী ছাড়া নেতা নাই।

অবশ্য বিপ্লব সফল হবার মুহূর্ত থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি শিয়াদের কাছ থেকে সুন্নীর পৃথক করার চেষ্টা চালিয়ে আসছে জোরে-শোরে। তারা সুন্নী অধ্যুষিত এলাকা তথা বিশেষ করে কুর্দিস্তানে, বালুচ, তুর্কম্যান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকদের বিভিন্ন প্রকারে উসকানি দিয়ে ইরান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টাও চালিয়ে এসেছে

www.pathagar.com

তবে আজ একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, শিয়া-সুন্নী প্রশ্নে যারা উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে তারা আমেরিকা, ইরাক ও ইসরাইলের অনুচর মাত্র। তাই এ সফরের প্রেক্ষিতে যেটা আমার উপলব্ধি হয়েছে, তা হলো যে, ইরানে শিয়া এবং সুন্নী জনতার মধ্যে কোন সংঘাত নেই। যদি কোন সংঘাত থেকে থাকে সেটা হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের মধ্যে তথা সত্য ও মিথ্যার মধ্যে। শুধু শিয়া-সুন্নী কেন ইসলামের দাবীদার আরব জাহানের মতো কোন প্রকার সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের গ্লানিও তাদের স্পর্শ করে নি। তাই তেহরানের প্রবেশদ্বার মেহরাবাদ বিমান বন্দরে বড় বড় ব্যানারে খচিত রয়েছে : "আরবের ওপর আজমের এবং আজমের ওপর আরবের কোন প্রকার প্রধান্য নেই। তোমরা আদমের সন্তান এবং আদমকে তৈরী করা হয়েছে মাটি থেকে" ইত্যাদি শ্লোগান।

এ বিপ্লবে সাফল্যের পিছনে যে পটভূমিকা কাজ করেছে বলে আমার মনে হয়েছে—তা হলো ইরানী জাতি তথা ওলামা ও যুব-সমাজের আত্মত্যাগ পরকালে মুক্তির উপায় হিসেবে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শাহাদাত লাভের প্রেরণা। 'বেহেশতে জাহরা' গোরস্থানে গেলেই সে আত্মত্যাগের নিদর্শন আন্দাজ করা যায়। এতে কবরের সংখ্যা কমপক্ষে ৬০ হাজার। আর এর মধ্যে যুবকদের সংখ্যা হবে পঞ্চাশ হাজার নিঃসন্দেহে। ১৯৪১ সনে ক্ষমতা লাভের পর থেকে বিপ্লব সফল হওয়া পর্যন্ত শাহ তার 'সাভাক' বাহিনীর মাধ্যমে নির্যাতনের যে তান্ডবলীলা চালিয়েছিল তা হিটলারের নাজী বাহিনীর অত্যাচার থেকে কোন অংশে কম ছিল না। দেশের শহরে বন্দরে আর গ্রামে-গঞ্জে কত নিরীহ পিতা-মাতার নিরীহ সন্তান যে এই গুপ্ত ঘাতক-দের হাতে গুম ও নিহত হয়েছে তার সঠিক পরিসংখ্যান ইতিহাস কখনো দিতে পারবে কি? লিবিয়ার একটি প্রখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রিকা আস-সিয়াসিয়া' ১৯৭৯ সালের ১৩ই মার্চ সংখ্যায় নিহতদের একটি তালিকা প্রকাশ করেছিল। শাহের ক্ষমতার শেষ পাঁচ মাসে জেলে নিহত ১২ হাজার ৮শ ২৭ ব্যক্তি সহ এই সাইত্রিশ বছরে জীবনে যে ৩ লাখ ৫৯ হাজার ৯০৬ জন মানুষকে হত্যা করেছে। আমাদের আশ্চর্য লাগে বিপ্লবোত্তর কালে ইসলামী আদালতে বিচার এই পর্যন্ত যে কিছু সংখ্যক লোকের প্রাণ দন্ডাদেশ কার্যকর হয়েছে-পাশ্চাত্যের গণমাধ্যম গুলো তার জন্যে সারা বিশ্বে মাতম ও রোনাজারী শুরু করে দিয়েছে

www.pathagar.com

এবং এতেই এমন কি আমাদের কিছু সংখ্যক মুসলিক ভাই-বোনও বিভ্রান্ত হচ্ছেন। অথচ যুগযুগ ব্যাপী সাভাকের এই হত্যাকান্ডের সময় এই দরদী (?) গণমাধ্যমগুলোর নীরবতার পিছনে কোন যাদু মন্ত্রের প্রভাব কাজ করেছিল আমরা বুঝে উঠতে পারি না। অথচ হত্যার বদলে হত্যা এ শুধু ইসলামের বিধান নয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের যে কোন দেশে আজও তা কার্যকর হতে দেখা যাচ্ছে। আসল কথা হচ্ছে ইসলামের শত্রুরা ইরানের ইসলামী বিপ্লবকে নস্যাত এবং হেয় প্রতিপন্ন করার লক্ষ্যেই দেশে দেশে এই হীন প্রপাগান্ডা শুরু করে দিয়েছে যে ইমাম খোমেনীর বিপ্লবে রক্তের গন্ধ আছে। আর শাহ্ ও তার সাভাক বাহিনী যে লাখ লাখ মানুষকে হত্যা করেছিল তখন তাতে গোলাপের সৌরভ ছড়িয়েছিল।

কাজেই দেশে এবং আন্তর্জাতিকভাবে ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ইরানী জনগণের তথা মুসলিম মিল্লাতের সংগ্রাম শেষ হয় নি। আর কত অনাগত কাল ধরে তা চলতে থাকবে তা বলা মুশকিল। ইরান সফরে আমরা তাদের সে সংগ্রাম মুখর জীবনেরই প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছি। দেখতে পেয়েছি আল্লাহ্র রাহে নিজেদের জীবন ও সম্পদকে বিলিয়ে দেয়ার এক দুর্দমনীয় জজ্বা তেজোদ্দীপ্ত মনোভাব। এই জজবা ইরানী জাতীর মন-মগজ এবং ধ্যান-ধারণাকে আচ্ছন্ন ও পরিব্যাপ্ত করেছে বলেই আজ তারা প্রাচ্য-পাশ্চাত্য এবং দেশীয় ও আন্তর্জাতিক দুশমনদের মোকাবিলায় বিজয়ের পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মুসলিম জাহানের দায়িত্ব আজ উচিৎ তাদের সে বিজয়ের পতাকাকে সমুন্নত রাখতে সহায়তা করা।

বিপ্লবের বৈশিষ্ট্য

যে কোন বিপ্লবের কতগুলো স্বাভাবিক দাবী আছে। এগুলো উত্তীর্ণ হবার মধ্যেই বিপ্লবের সাফল্য নিহিত থাকে। এগুলো হচ্ছে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঃ কর্মী ও বিপ্লবের অনুসারীদের মধ্যকার ঐক্য ও সংহতি, স্থিতিশীলতা এবং সমাজ বিপ্লবে একটি নতুন ধারার অনুবর্তন। আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে ইরানের ইসলামী বিপ্লবের ধারাগুলোকে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করেছে। ইরানের ইসলামী বিপ্লব সর্বাত্মক কল্যাণধর্মী বিপ্লব। বিশ্বের যে কোন বিপ্লব থেকেই এর প্রকৃতি ও মেজাজ স্বতন্ত্র। আমরা বিপ্লবের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এখানে আলোচনা করার প্রয়াস পেলাম।

www.pathagar.com

১. আলেমদের নেতৃত্ব ঃ আখেরী নবীর উম্মৎ হিসেবে আমাদেরকে একথা অবশ্যই মানতে হবে যে, আলেমগণই হচ্ছে নবীদের উত্তরাধিকারী। ইরানের ইসলামী বিপ্লব নিঃসন্দেহে সে দেশের তথা মুসলিম বিশ্বের সেরা আলেমদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয়েছে।

২. ইসলামী রেনেসাঁর পুনরুজ্জীবন ঃ প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে গ্লানিকর অপ-সংস্কৃতির মূলোৎপাঠন করে যেখানে ইসলামী আদর্শবাদের অনুসৃত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম চালু করা হয়েছে চলনে, বলনে এবং সামাজিক কার্যক্রমের সর্বক্ষেত্রে ইসলামী সংস্কৃতির যথার্থ প্রতিফলন ঘটাবার জন্যে ব্যাপক কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। তাদের চিত্রকলা এবং সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নগ্ন সংস্কৃতির মোকাবিলায় ইসলামী সংস্কৃতির কি অদ্ভুত রূপায়ণ ঘটেছে তেহরান নগরীর পথ-ঘাট তার স্বাক্ষর বহন করছে। তাদের একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হচ্ছে "লা শারকিয়া, লা গরবিয়া,—আস্ সাওরিয়া ইসলামিয়া—অর্থাৎ আমরা প্রাচ্যেরও নই পাশ্চাত্যেরও নই, ইসলামই আমাদের লক্ষ্য। মোটকথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং ইসলামী সংহতির পুনরুজ্জীবন হচ্ছে এ বিপ্লবের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য।

৩. স্বৈরতন্ত্রের বিরোধী ভাবধারা ঃ রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে একটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠাই ছিল ইমাম খোমেনীর মূল লক্ষ্য। বিপ্লব সফল হবার সাথে সাথে সেটা সফল হয়েছে। কিন্তু স্বৈরতন্ত্র সম্পর্কে ইরানে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে একটি স্থানীয় ঘৃণাবোধ জন্মেছে তা উপলব্ধি করার মতো। ইরানের নারী পুরুষ কৃষক মজুর সকলেই এ ব্যাপারে সজাগ। কাজেই সহসা স্বৈরতন্ত্রের কোন ভূত চেপে বসতে পারে এমন আশংকা বাতুলতা মাত্র। শুধু স্বৈরতন্ত্র নয় উপনিবেশবাদ, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদ এবং পরাশক্তির লীলাখেলা সম্পর্কেও ইরানের সর্বস্তরের মানুষ সচেতন এবং কথায় কথায় তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করে। ইমামের বিজয়ী শক্তি তথা আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের নির্ভশীলতা এতোখানি যে, তারা পৃথিবীর পরাশক্তিগুলোকে অতিশয় সামান্যই মনে করে।

৪. নারী জাগরণ ঃ ইরানী বিপ্লবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, নারীরা তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরে পেয়েছে। শাহী আমলে নারীদেরকে পণ্য হিসেবে গণ্য করা হতো। কিন্তু বিপ্লবের মন্ত্রে

www.pathagar.com

দীক্ষিত নারী সমাজ যাবতীয় অশ্লীলতা ও প্রগলভতার পথ পরিহার করে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠেছে। পর্দা এখন তাদের ভূষণে পরিণত হয়েছে। তারা বিপ্লবের সমান অংশীদার। ইমাম খোমেনীর ভাষায় 'নারীর পর্দা শহীদের রক্তের চাইতেও পবিত্র' কথাটির মর্যাদা ইরানী নারী জাতি শুধু আক্ষরিক অর্থেই নয়, জীবনের সার্বিক অনুভূতি দিয়ে রক্ষা করেছে। জাতীয় জীবনে সর্বপ্রকার কর্মকান্ডে নারীরা অংশ নিচ্ছে; কিন্তু পর্দা তাদের বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। নারী জাগরণের এ দৃশ্য পৃথিবীর কোন কালে আর কোথাও পরিদৃষ্ট হয়েছিল কিনা আমার জানা নেই।

৫. সমন্বয় ঃ এই বিপ্লবের আরেক একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ওলামা ও আধুনিক শিক্ষিত লোকদের মধ্যে সমন্বয় সাধন। পাশ্চাত্যের বরং দেশীয় বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হতে বেরিয়ে আশা উচ্চশিক্ষিত আধুনিক লোকেরা বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে আলেমদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু তাই নয় তারা রাষ্ট্রীয় জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডে আলেমদের কর্তৃত্ব আনন্দ চিত্তেই গ্রহণ করেছে। অতীতের সংঘাতময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে তারা একটি ভ্রাতৃত্বের সমাজ গঠনে চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। অবশ্য কিছু সংখ্যক লোক যে সে সংঘাত বাঁধিয়ে আলেমদের থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করতে চাচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য।

৬. দুর্বলের অধিকার প্রতিষ্ঠা ঃ বিপ্লবের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতিত মজলুম জনগণ তাদের হৃত অধিকার ফিরে পেয়েছে। এতদিন ইরানের জনগণ দুভাগে বিভক্ত ছিল। "বাদশার" আশ্রয়ে লালিত মুতাকাব্বেরীন (ধনিক শ্রেণী) আর সমাজ বিচ্ছিন্ন মুজতাদ আফিন (নিঃস্ব-দরিদ্র) বিপ্লবে মুজতাদ আফিনগণ ইমামের বড় দোসর ছিল। তাদের ত্যাগও ছিল অপরিসীম। কারণ ইমাম প্রবাসী জীবনের শুরু থেকেই এই নিঃস্বদের জন্যে সংগ্রাম করে এসেছেন। গ্রাম-গঞ্জ ছাড়াও সুসজ্জিত তেহরান নগরীর দক্ষিণ অঞ্চল বিচরণ করলে মুজতাদ আফিনদের করুণ দৃশ্য পর্যটকদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। Poor area (দরিদ্র অঞ্চল) বলে খ্যাত এই এলাকায় এখনো যে আদিম যুগের মতো লোকেরা মাটির গুহায় বাস করছে। ইমাম খোমেনী এবং তার অনুগামী বিপ্লবী আলেমগণ জীবনোত্তর এদের জন্যে দরদ দিয়ে সংগ্রাম করে এসেছিলেন। অত্যন্ত সুখের কথা যে

www.pathagar.com

বিপ্লব পরবর্তী জীবনে ইমাম খোমেনী সর্বপ্রথমই তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে মনোযোগী হয়েছেন। আর তারই ফলশ্রুতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মুজতাদ আফিন ফাউন্ডেশন এবং জিহাদ এ জিন্দেগী নামে দু'টি পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সংস্থা। ১৯৭৯ সালের ১৬ই জুন গঠিত "জিহাদী জিন্দেগীর" কার্যক্রম বর্তমানে সুদূরপ্রসারী অবদান ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

৭. বিশ্ব মুসলিমের ঐক্য ঃ এ বিপ্লব বিশ্ব মুসলিমের ঐক্যের পথ সুগম করে দিয়েছে। ইরানের আর একটি জনপ্রিয় শ্লোগান হচ্ছে ঃ "আমরা শিয়াও নই, সুন্নীও নই, আমরা মুসলমান।" অর্থাৎ শিয়া সুন্নীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা যাবে না এটা হচ্ছে বিপ্লবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর সর্বত্রই মুসলমানদের মধ্যে ধর্মীয় মতপার্থক্য ঐক্যের পথে একটি বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু ইরান শিয়া অধ্যুষিত দেশ হয়েও এ ব্যাপারে যে নমনীয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা মুসলিম মিল্লাতের সংহতির পক্ষে খুবই সহায়ক। শুধু তাই নয়, প্রাচুর্যের বলে নয়, খোদাভীতি এবং ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ এই মূলনীতির ভিত্তিতে ইরান সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যে ডাক দিয়েছে। ইরানের এই ডাক আরবের জাতীয়তাবাদী জাহেলিয়াতের মূলেও কুঠারাঘাত করেছে—যার জন্যে আরবের মার্কিনপন্থী এবং জাতীয়তাবাদী রাজ-রাজারা ইরানের বিপ্লবের বিরুদ্ধাচরণ করে যাচ্ছেন। ইরানের উপর সমাজতন্ত্রী ইরাকের চাপিয়ে দেয়া যুদ্ধের পশ্চাতে তাদের মদদ যোগানোর কারণও এটাই। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস সাম্রাজ্যবাদ অথবা তাদের অনুচরদের কোন প্রকার ভ্রুকুটিই ইরানের ইসলামী বিপ্লবের এই জয়যাত্রাকে স্তব্ধ করতে পারবে না—আল্লাহ্‌র কাছে এটাই প্রার্থনা।

———

www.pathagar.com

সাংবাদিকের চোখে ইসলামী বিপ্লব